POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুলের ডাকে, যখন সে তোমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারে।

(সূরা আনফাল: ২৫)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 1-2

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 4-11 Jan, 2024 21-28 জামাদিউল সানি 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত সীমার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি

২৪৯৩) হযরত নুমআন বিন বশীর (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন:যে ব্যক্তি আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমায় প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে ব্যক্তি সেই সীমা লঙ্ঘন করে তাদের উপমা সেই ব্যক্তিদের ন্যায় যারা একটি নৌকায় ভাগ্য নির্ধারণের মাধ্যমে নিজেদের স্থান বেছে নেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চ শ্রেণীর আসন পায় আবার কেউ কেউ নিম্ন শ্রেণীর আসন পায়। যারা সেই নৌকার নিম্ন শ্রেণীর আসন পায় তাদের পানির প্রয়োজন হলে উচ্চ শ্রেনীর মানুষদের মধ্য দিয়ে যেতে হত। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে, আমরা যদি আমাদের কক্ষে একটি ছিদ্র করে দিই আর আমরা উপরের কক্ষের লোকদের কষ্টে না ফেলি (তবে ভাল হবে) এখন যদি উপরের কক্ষের মানুষগুলো তাদেরকে এই কাজ করার অনুমতি দেয়, যা তারা মনঃস্থির করেছে, তবে তারা সকলেই ধ্বংস হবে। আর যদি তারা তাদের হাত ধরে ধরে নেয় (তাদের বিরত রাখে) তবে তারাও নাজাত পাবে এবং অন্যান্য সকলেও নাজাত পাবে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শিরকাহ, ৪র্থ খণ্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৭ ও ২৪ শে নভেম্বর ২০২৩

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত

যদি কেউ নাজাত চায় এবং পবিত্র জীবন বা শ্বাশত জীবনের আকাঙ্খী হয়, তবে সে যেন আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করে এবং প্রত্যেকে সেই মর্যাদা লাভের চেষ্টা ও চিন্তায় নিয়োজিত হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ খোদায় বিলীন না হয়, খোদার মধ্যে বিলীন হয়ে মৃত্যু না বরণ করে সে নতুন জীবন পেতে পারে না।

মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ না করে, তবে তাকে স্মরণ রাখা উচিত যে, এমন মানুষদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

খোদা তা'লার পথে আত্মোৎসর্গ করুন

এই পথে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে আর কেবল আল্লাহর কৃপা ও কল্যাণে আমি সেই আনন্দ ও সুখানুভব লাভ করেছি। আমার বাসনা এটাই যে, আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করার জন্য যদি আমার মৃত্যু হয় এবং পুনরায় জীবিত হই এবং পুনরায় মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত হই, তবে প্রত্যেক বার আনন্দসহকারে আমার আসক্তি ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

অতএব, যেহেতু আমার নিজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এই জীবন উৎসর্গীকরণের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন আবেগ দান করেছেন যে, যদি আমাকে একথাও বলে দেওয়া হয় যে, এর ফলে কোন পুণ্য ও কল্যাণ লাভ হবে না,বরং দুঃখ-কষ্ট লাভ হবে। তবু ইসলামের সেবা থেকে আমি নিবৃত্ত হতে পারি না। তাই জামাতকে উপদেশ দেওয়া এবং এই কথাটি তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। পরবর্তীতে একথা শোনা বা না শোনার এক্তিয়ার প্রত্যেকেরই আছে। যদি কেউ নাজাত চায় এবং পবিত্র জীবন বা শ্বাশত জীবনের আকাঙ্খী হয়, তবে সে যেন আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে এবং প্রত্যেকে সেই মর্যাদা লাভের চেষ্টা ও চিন্তায় নিয়োজিত হয়,যাতে বলা যেতে পারে যে তার জীবন, মৃত্যু, কুরবানী, নামায আল্লাহ্‌র জন্যই এবং হযরত ইব্রাহিম এর ন্যায় তাঁর আত্মা বলে উঠে اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আল বাকারা: ১৩২) যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ খোদায় বিলীন না হয়, খোদার মধ্যে বিলীন হয়ে মৃত্যু না বরণ করে সে নতুন জীবন পেতে পারে না।

অতএব, যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, আমি মনে করি, খোদার কারণে জীবন উৎসর্গ করার মাঝেই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিহিত। অতঃপর তোমরা নিজেদের মাঝে দেখ, তোমাদের মাঝে কতজন আছে যারা আমার এই কর্মকে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং খোদার কারণে জীবন উৎসর্গ করা পছন্দ করে।

মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ না করে, তবে তাকে স্মরণ রাখা উচিত যে, এমন মানুষদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যেমনটি কিছু নির্বোধ ও অপাঙক্তেয় মানুষের ধারণা, প্রত্যেককে জাহান্নামে অবশ্যই যেতে হবে। এমন ধারণা ভুল। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এমন মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য যারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে আর এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। খোদা তা'লা বলেন قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ (সাবা: ১৪) [আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্প লোকই শোকরগুজার (কৃতজ্ঞ)]

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০১)

এর অর্থ পরকালের সঙ্গেই সম্পৃক্ত করতে হবে এমনটি জরুরী নয়। বরং ভীষণ যুদ্ধ বা ভূমিকম্পের সময়ও এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ সুরা হজ্জ এর ২ ও নংআয়াত

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۞

-এর ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াত প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে এর অর্থ পরকালের সঙ্গেই সম্পৃক্ত করতে হবে এমনটি জরুরী নয়। বরং ভীষণ যুদ্ধ বা ভূমিকম্পের সময়ও এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৯০৫ সালে কাঙড়ার ভূমিকম্পে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় এবং বহু মানুষ আহত হয়।গ্রামের পর গ্রাম এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যায় যেগুলির নাম-চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। সমগ্র পাঞ্জাবের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়। সেই সময়ও মানুষের অবস্থা ঠিক এমনই হয়েছিল। অনুরূপভাবে ১৯৩৫ সালে যখন কোয়েটায় ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের পর আহত ও ভূমিকম্পের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া মানুষরা বিশেষ ট্রেনে করে ফিরে এল, তখন তারা উন্মাদের ন্যায় রোদন করছিল আর স্টেশনে এদিক সেদিক নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের সন্ধান করছিল। আর তারা নিজের কোন আত্মীয় স্বজনকে দেখতে না পেয়ে তাদের কান্নার রোলে পরিবেশ শোক বিহ্বল হয়ে উঠত। এক পত্রিকার কলামিস্ট লেখেন- আমি আমার স্ত্রীকে দেখেছি স্টেশনে এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে যেভাবে সুরাসক্ত মত্ত

এরপর শেষ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হিজরতের পরে মুসলমান এবং ইহুদীদের মাঝে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেই অনুযায়ী মহানবী (সা.) একজন সাধারণ নাগরিকের মর্যাদা রাখতেন না, বরং তিনি সেই প্রজাতন্ত্রের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন যা মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এবং রাজনৈতিক বিষয়াদিতে যে সিদ্ধান্ত তিনি উপযুক্ত মনে করতেন তা জারি করার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

তিনি (সা.) যদি দেশের শান্তি র স্বার্থে কা'বের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন , তবে এতে আহামরি কোনো সমস্যা ছিল না, (অতএব) এ কারণে তেরশ' বছর পর অধুনাকালের প্রাচ্যবিদরা ইসলামের ওপর যে আপত্তি উত্থাপন করছে তা অর্থহীন, কেননা সে সময় ইহুদীরা তাঁর (সা.) কথা শুনে কোনো আপত্তি করে নি।

অনেক শান্তি প্রিয় সাধারণ মানুষের জীবন বিপদাপন্ন হওয়া ও দেশের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার পরিবর্তে একজন দুষ্কৃতিকারী ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তির নিহত হওয়া অনেক উত্তম।

উমর!কোনো চিন্তা কোরো না। খোদা তা'লা চাইলে হাফসা, উসমান এবং আবু বকরের চেয়েও উত্তম স্বামী পাবে আর উসমান, হাফসার চেয়ে উত্তম স্ত্রী পাবে।

মহানবী (সা.) যেভাবে তাঁর সন্তান হযরত ফাতেমা (রা.)-কে ভীষণ ভালোবাসতেন, অনুরূপভাবে হযরত ফাতেমা (রা.)'র সন্তানদের প্রতিও তাঁর বিশেষ ভালোবাসা ছিল। অনেকবার তিনি (সা.) বলেছেন, হে খোদা! আমি এই শিশুদের ভালোবাসি, তুমিও এদের ভালোবাসো এবং যারা এদেরকে ভালোবাসবে তুমি তাদেরকেও ভালোবেসো।

ফুরাত বিন হাইয়ান-এর ইসলাম গ্রহণ এবং কাআব বিন আশরফ এর হত্যার ঘটনার বিবরণ

ফিলিস্তিনের অত্যাচারিতদের জন্য দোয়ার পুনঃ পুনঃ আবেদন।

মনে হচ্ছে, এখন পৃথিবী নিজের ধ্বংসকে নিকটতর করছে। আর এই ধ্বংসযজ্ঞের পর যারা বেঁচে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক-বুদ্ধি দিন, তারা যেন খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং তাঁর দিকে (যেন) ফিরে আসে। যাহোক, আমাদের এ প্রেক্ষিতে অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীর প্রতি কৃপা করুন।

জাতিসংঘের মহাসচিবও জোরালো কথা বলেন, আজকাল তো আরো বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলছেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, তার কথার কোনো গুরুত্ব নেই। মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অথবা এই যুদ্ধের যদি আরও বিস্তৃতি ঘটে এবং বিশ্ব যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে তবে জাতিসংঘেরও অবসান ঘটবে। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৭ ই নভেম্বর, , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (১৭ নবুয়ত ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,গত খুতবার শেষের দিকে যে ইতিহাস বর্ণিত হচ্ছিল বা মহানবী (সা.)-এর সীরাত তথা জীবন চরিত বর্ণিত হচ্ছিল সে প্রসঙ্গে ফুরাত বিন হাইয়ান-এর ইসলাম গ্রহণেরও উল্লেখ করা হয়েছিল। তার ইসলাম গ্রহণের আরও বিশদ বিবরণ হলো, সে আটক হয়ে বন্দিদের মাঝে ছিল, যেমনটি গত খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল। বদরের যুদ্ধের দিনও সে আহত হয়েছিল। তথাপি সে কোনোভাবে বন্দিদশা থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। এবার পুনরায় সে মুসলমানদের হাতে আটক হয়। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে দেখমাত্রই বলেন, এখনও কি তুমি তোমার কর্মপন্থা পরিবর্তন করবে না? ফুরাত বলে, আমি যদি এবার মুহাম্মদ (সা.)-এর হাত থেকে বেঁচে যাই তাহলে আর কখনো ধরা পড়ব না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করে নাও। অর্থাৎ যদি তুমি বাঁচতেই চাও তাহলে একটিই উপায় রয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করে নাও। যাহোক, ফুরাত বিন হাইয়ান হযরত আবু বকর (রা.)'র একথা শুনে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সকাশে যেতে আরম্ভ করে। নিজের এক আনসার মিত্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে বলে যে, আমি তো মুসলমান। আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন,'সে ইসলাম গ্রহণ করেছে'। মহানবী (সা.) তার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দিয়ে বলেন, إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ । অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তোমাদের মাঝে কতেক এমন মানুষও রয়েছে যাদেরকে আমরা তাদের ঈমানের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে যদি বলে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তাহলে ঠিক আছে; এটি তার ও আল্লাহ্ তা'লার বিষয়। যাহোক, এ কারণেমহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দেন। (আল আসাবা , ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৭৩) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৬ ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৮]

আরেকটি বিবরণ এমনও রয়েছে যে, তৃতীয় হিজরী সনের জমাদিউল আখের মাসে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র একটি অভিযান 'কারাদা' নামক স্থান অভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছিল।সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) এই ঘটনাটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন যে, বনু সুলায়েম ও বনু গাতফানের আক্রমণ থেকে কিছুটা অবকাশ পেতেই আরেকটি বিপদকে প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের স্বদেশ থেকে বের হতে হয়েছে। এতদিন কুরাইশরা নিজেদের উত্তরাঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য সাধারণত হেজাযের সমুদ্রতীরবর্তী পথ দিয়ে সিরিয়ায় যাতায়াত করত। কিন্তু এখন তারা উক্ত পথ পরিহার করে, কেননা এই অঞ্চলের গোত্রগুলো মুসলমানদের মিত্র হয়ে গিয়েছিল; আর কুরাইশদের জন্য দুষ্কৃতির সুযোগ কম ছিল। বরং এমন পরিস্থিতিতে তারা এই সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তাকে স্বয়ং নিজেদের জন্য বিপদের কারণ বলে মনে করত। অর্থাৎ কারণ শুধু এটিই ছিল না যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল, বরং তারা নিজেরা যেসব দুষ্কৃতি করতে চাইত, এখন সেসব গোত্রের মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের ধারণা ছিল যে, আমরা এখন আর তা করতে পারব না এবং মুসলমানদের ক্ষতি করতে পারব না। যাহোক, এখন তারা উক্ত পথ পরিহার করে নজদ-এর রাস্তা বেছে নেয়, যা ইরাক অভিমুখে যেত। আর যার আশেপাশে কুরাইশদের মিত্র এবং মুসলমানদের প্রাণের শত্রুরা ছিল। পূর্বের (যাতায়াত) পথগুলো এমন ছিল যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি হয়েছিল। আর সেই পথ যেটিকে কুরাইশরা বেছে নিয়েছিল সেখানে ছিল তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ (গোত্রগুলো)। আর সেসব মানুষ এবং গোত্রের বসবাস ছিল যারা মুসলমানদেরও

প্রাণের শত্রু ছিল, আর তারা ছিল সুলায়েম ও গাতফান গোত্র। অতএব জমাদিউল আখের মাসে মহানবী (সা.) এই সংবাদ পান যে, মক্কার কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা নজদ-এর পথ দিয়ে অতিক্রম করতে যাচ্ছে। এমনিতেই কুরাইশদের কাফেলাগুলোর সমুদ্রতীরবর্তী পথ দিয়ে যাতায়াত মুসলমানদের জন্য আশঙ্কার কারণ ছিল।সেক্ষেত্রে নজদের পথ দিয়ে তাদের যাতায়াতও তেমনই বরং তার চেয়ে বেশি আশঙ্কাজনক ছিল। কেননা সমুদ্রতীরবর্তী রাস্তার বিপরীতে এই পথে কুরাইশদের মিত্রদের বসতি ছিল, যারা কুরাইশদের মতোই মুসলমানদের রক্তপিপাসু ছিল। আর যাদের সাথে মিলে কুরাইশরা অতি সহজেই মদীনায় চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে পারত অথবা কোনো দুষ্কর্ম করতে পারত। এছাড়া কুরাইশদের দুর্বল করার এবং তাদেরকে সন্ধি করতে সম্মত করানোর জন্যও এই পথে তাদের কাফেলাগুলোর যাতায়াত প্রতিহত করাও আবশ্যক ছিল। এ কারণেই মহানবী (সা.) এই সংবাদ পাওয়া মাত্রইতাঁর মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র নেতৃত্বে স্বীয় সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন। কুরাইশের এই বাণিজ্যিক কাফেলায় আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা'র মতো (জ্যেষ্ঠ) নেতারাও উপস্থিত ছিল। যায়েদ (রা.) পরম নৈপুণ্য ও সতর্কতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করেন আর নজদ-এর 'কারাদা' নামক স্থানে ইসলামের এই শত্রুদের ধরে ফেলেন। আর এই অতর্কিত আক্রমণে বিচলিত হয়ে কুরাইশ সদস্যরা কাফেলার মালপত্র এবং (সাথে বহন করা) তাদের যে সম্পদ ছিল তা ফেলে পালিয়ে যায়। আর যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা বিশাল (পরিমাণ) গণিমতের মালসহ সফল ও বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, কুরাইশের এই কাফেলার পথপ্রদর্শনকারী ছিল ফুরাত নামের এক ব্যক্তি, যে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয় আর ইসলাম গ্রহণের কারণে মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের গুপ্তচর ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে হিজরত করে মদীনায় চলে আসে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ. পৃ: ৪৬৫)

সেই দিনগুলোরই একটি ঘটনা হলো কা'ব বিন আশরাফের হত্যা সংক্রান্ত। কা'ব বিন আশরাফ মদীনার একজন সর্দার বা নেতা ছিল। আর মহানবী (সা.)-এর সাথে চুক্তিভুক্ত ছিল। কিন্তু সন্ধি করার পর সে নৈরাজ্য ছড়ানোর চেষ্টা করে আর মহানবী (সা.) তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

বুখারীতে এই ঘটনার বিশদ বিবরণে লেখা আছে যে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, কা'ব বিন আশরাফের সাথে কে বোঝাপড়া করবে? সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কি চান, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। অতএব মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) কা'ব এর কাছে আসেন আর বলেন, সেই ব্যক্তি আমাদের কাছে সদকা চেয়েছেন আর তিনি আমাদেরকে কঠিন অবস্থায় নিপতিত করেছেন। {অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি এই কথা বলেন, তিনি আমাদের কাছে সদকা চেয়েছেন এবং আমাদেরকে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছেন।} আমি তোমার কাছে ধার নিতে এসেছি। সে বলে, খোদার কসম! তুমি তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে। {অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে এবং পিছু হটবে।}যাহোক, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আমরা যেহেতু তাঁর অনুসারী হয়েছি তাই আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করা পছন্দ করি না যতক্ষণ না আমরা দেখব যে, তঁ ার পরিণতি কী হয়। আর আমরা চাই তুমি আমাদেরকে এক বা দুই ওয়াসাক ধার দাও। কা'ব বলে, তাহলে আমার কাছে কিছু একটা বন্ধক রাখো। তিনি বলেন, তুমি কী চাও? সে অর্থাৎ কা'ব বলে, তোমাদের নারীদের আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বলেন, তোমার কাছে আমাদের নারীদের আমরা কীভাবে বন্ধক রাখতে পারি যখন কিনা আরবদের মাঝে তুমি সবচেয়ে সুদর্শন? সে বলে, তাহলে তোমাদেরপুত্রদের আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বলেন, আমরা তোমার কাছে নিজেদের পুত্রদের কীভাবে বন্ধক রাখতে পারি? তাদের প্রত্যেককে এই খোঁটা দেওয়া হবে (বা একথা) বলা হবে যে, তাদেরকে এক বা দুই ওয়াসাক (খাদ্যের) বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক, কিন্তু (আমরা) তোমার কাছে নিজেদের বর্মগুলো বন্ধক রাখছি। (এখানে বর্মগুলো বলতে যুদ্ধ সামগ্রী বুঝানো হয়েছে।) অতঃপর তিনি পুনরায় কা'বের কাছে আসার অঙ্গীকার করেন। অতএব, তিনি রাতের বেলা তার কাছে আসেন এবং তার সাথে আবু নায়েলাও ছিলেন, যিনি কা'বের দুধভাইও ছিলেন। সে তাদেরকে দুর্গে র ভেতরে ডাকে আর তারা যখন তার কাছে দুর্গের অভ্যন্তরেযায় তখন সে তার বালাখানা বা ওপর তলা থেকে নীচে নামে। তার স্ত্রী তাকে বলে, এসময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? কা'ব বলে, এরা (হলো) মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নায়েলা।তারা ডেকেছে (তাই) তাদের কাছে যাচ্ছি। (তখন) তার স্ত্রী বলে, আমি এমন শব্দ শুনছি যেন তা থেকে রক্ত ঝরছে। কা'ব বলে, সম্মানিত ব্যক্তিকে রাতের বেলা আক্রমণের জন্য ডাকা হলেও সে যাবে? যাহোক, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) নিজের সাথে আরো দুজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) সেই লোকদেরকে বলেন, কা'ব যখন আসবে তখন আমি তার চুল ধরবো এবং তাকে শুঁকবো। তোমরা যখন দেখবে যে, আমি তার মাথা শক্ত করে ধরে ফেলেছিতখন তোমরা এগিয়ে এসে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিবে। এরপর কা'ব গায়ে চাদর জড়িয়ে তাদের কাছে নীচে নেমে আসে এবং তার কাছ থেকে সুগন্ধির সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছিল। (তখন) মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আজকের মতো সুগন্ধির (সৌরভ) আমি কোথাও পাই নি, অর্থাৎ সর্বোত্তম সুগন্ধি। কা'ব বলে, 'আমার কাছে আরবের সর্বাপেক্ষা অধিক সুগন্ধি ব্যবহারকারিণী ও সবচেয়ে বেশি সুন্দরী রমণী রয়েছে।' মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, 'আমাকে তোমার মাথাশুঁ কার অনুমতি দিবে কি?' সে অনুমতি দিলে তিনি তার (মাথা) শুঁকেন এবং নিজের সঙ্গীদেরকেও শুঁকান। পুনরায় তিনি বলেন, আমাকে আরেকবার (শুঁকার) অনুমতি দিবে কি?' সে অনুমতি দেয় ,এরপর যখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাকে শক্ত করে ধরে ফেলেন তখন নিজের সঙ্গীদেরকে বলেন, তোমরাও তাকে ধরো, তখন তারা তাকে হত্যা করেন। এরপর তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং তাকে (হত্যার) সংবাদ দেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, রেওয়াতে নম্বর-৪০৩৭)

কা'বের আহত হওয়ার আরো বিশদ বিবরণ বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ (শরাহ্) উমদাতুল কারী'তে লেখা আছে যে, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তার সঙ্গীদের সাথে যখন কা'ব বিন আশরাফের ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করেন তখন তার একজন সঙ্গী হযরত হারেস বিন অওস (রা.)'র (শরীরে) তরবারির ফলার আঘাত লাগে এবং তিনি আহত হন। (নিজের সঙ্গীদের তরবারির ফলার আঘাতে আহত হয়েছিলেন।) অতএব, তার সঙ্গীরা তাকে তুলে নিয়ে দ্রুততার সাথে মদীনায় পৌঁছেন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। এরপর মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন অওস (রা.)'র ক্ষতস্থানে নিজের মুখের লালা লাগিয়ে দেন, এরপর তার আর কোনো কষ্ট হয় নি।

(উমদাতুল কারী, খণ্ড-১৭, পৃ :১৯২)

সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনাটি যেভাবে লেখা হয়েছে তার সারাংশ এখন আমি এখানে বর্ণনা করব। বদরের যুদ্ধ মদীনার ইহুদীদের হৃদয়ে লালিত শত্রুতাকে যেভাবে দৃশ্যপটে নিয়ে আসে এবং বনু কায়নু কাকে দেশান্তরিত করাও (যখন) অন্যান্য ইহুদীদের সংশোধনের প্র তি আকৃষ্ট করতে পারে নি এবং তারা তাদের দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্যে ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। অতএব, কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনাও এই ধারাবাহিকতারই একটি ফলাফল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কা'ব ইহুদী হলেও প্র কৃতপক্ষে সে ইহুদী বংশোদ্ভূ ত ছিল না, বরং আরব ছিল। তার পিতা আশরাফ, বনু নাবহানের এক চতুর এবং ধূর্ত ব্যক্তি ছিল, যে মদীনায় এসে বনু নযীরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের মিত্র সাজে, আর অবশেষে সে এতটা ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করে যে, বনু নযীরের জ্যেষ্ঠ রইস বা নেতা আবু রাফে' বিন আবুল হাকীক তার মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেয়। সেই মেয়ের গর্ভেই কা'বের জন্ম হয়, যে বড় হয়ে তার পিতার চেয়েও অধিক মর্যাদা অর্জন করে।অবশেষে সে এমন পদমর্যাদা অর্জন করে নেয় যে, সমগ্র আরবের ইহুদীরা তাকে নিজেদের সর্দারবা নেতা জ্ঞান করতে আরম্ভ করে। কা'ব একজন জ্ঞানী ও সুপুরুষ হওয়ার পাশাপাশি একজন প্রতিভাবান কবি ও অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। সর্বদা নিজ জাতির ওলামা এবং অন্যান্য প্রভাবসম্পন্ন লোকদেরকে নিজের আর্থিক উদারতা দ্বারা নিজের করতলগত করে রাখতো, কিন্তু চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে চরম নোংরা স্বভাবের মানুষ ছিল। আর গোপন ষড়যন্ত্র এবং শত্রুতার কৌশলে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। [এমন কোনো মন্দ নেই যা তার মাঝে ছিল না]। মহানবী (সা.) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন কা'ব বিন আশরাফও অন্যান্য ইহুদীদের সাথে একাত্ম হয়ে সেই চুক্তিতে যোগদান করে যা মহানবী (সা.) এবং ইহুদীদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব , শান্তি , নিরাপত্তা ও সম্মিলিত প্রতিরক্ষা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বাহ্যত সে এই চুক্তি করেছিল ঠিকই, কিন্তু আভ্যন্তরীণভাবে কা'বের হৃদয়ে হিংসা এবং বিদ্বেষের অগ্নি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। আর সে গোপন কৌশল ও ষড়যন্ত্রে র মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)-এর বিরোধিতা আরম্ভ করে। বর্ণিত আছে, কা'ব প্র তিবছর ইহুদী আলেম-ওলামা ও মাশায়েখদের অনেক উপহার উপঢৌকন বা ভাতা প্রদান করত, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পর যখন তারা নিজেদের বার্ষিক অযিফা বা ভাতা নেওয়ার জন্য তার কাছে যায় তখন সে কথাচ্ছলে তাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর উল্লেখ করতে থাকে এবং তাদের কাছে তাঁর (সা.) সম্পর্কে ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর আলোকে মতামত জানতে চাইলে তারা বলে, বাহ্যত তো তিনি সেই নবী বলেই মনে হয়, তওরাতে আমাদেরকে যাঁর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই উত্তরে কা'ব খুবই রাগান্বিত হয় এবং সবাইকে অনেক গালমন্দ করে বিদায় করে দেয়। আর তাদেরকে যে ভাতা প্রদান করত- তা দেয় নি। ইহুদী আলেমদের যখন উপার্জন বন্ধ হয়ে যায় তখন কিছুদিন পর তারা আবার

কা'বের কাছে গিয়ে বলে, লক্ষণাবলী অনুধাবনে আমাদের ভুল হয়েছিল; আমরা পুনরায় অভিনিবেশ করেছি। আসলে মুহাম্মদ (সা.) সেই নবী নন যাঁর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই উত্তরে কা'বের স্বার্থ চরিতার্থ হয় এবং সে আনন্দিত হয়ে তাদেরকে বার্ষিক ভাতা দিয়ে দেয়। যাহোক, এটি ছিল একটি ধর্মীয় বিরোধিতা, যদিও তা অসৌজন্যমূলকভাবে অবলম্বন করা হয়েছিল কিন্তু আপত্তির কারণ হতে পারে না, যাতেসে শাস্তি পাবে আর এর ভিত্তিতে কা'বকে আপত্তির লক্ষ্যেও পরিণত করা যেতে পারতো না। এরপর কা'বের বিরোধিতা ক্রমশ ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। অবশেষে বদরের যুদ্ধের পর সে এমন আচার-আচরণ প্রদর্শন করে যা ছিল চরম নৈরাজ্যকর ও অশান্তির কারণ। যার ফলে মুসলমানদের জন্য চরম আশঙ্কাজনক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আসলে বদরের (যুদ্ধের) পূর্বে কা'ব মনে করত যে, মুসলানদের ঈমানের জোশ বা উদ্দীপনা একটি সাময়িক ব্যাপার মাত্র আর ধীরে ধীরে এসব মানুষ আপনা-আপনি {মহানবী (সা.) থেকে} বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্মেফিরে আসবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন এক অপ্রত্যাশিত বিজয় লাভ করে আর কুরাইশ নেতাদের অধিকাংশ নিহত হয় তখন সে বুঝতে পারে যে, এখন এই নতুন ধর্ম এমনিতেই নিশ্চিহ্ন হবে বলে মনে হচ্ছে না। কাজেই, বদরের (যুদ্ধের) পর সে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করার লক্ষ্যে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করার বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়।

আর তার হৃদয়ের বিদ্বেষ ও হিংসার সর্বপ্রথম বহিঃপ্রকাশ সেসময় ঘটে যখন বদরের (যুদ্ধের) বিজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে;তখন এই সংবাদ শুনে কা'ব সাক্ষীস্বরূপ প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ ভুল মনে হচ্ছে, কেননা কুরাইশের এই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে মুহাম্মদ (সা.)-এর বিজয় অর্জন করা আর মক্কার এমন নামিদামি নেতাদের মাটির সাথে মিশে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে এই জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। যাহোক, যখন এই সংবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন হয় এবং কা'বের এই দৃঢ় বিশ্ব াস জন্মে যে, সত্যিকার অর্থে ই বদরের (যুদ্ধের) বিজয় ইসলামকে এমন দৃঢ়তা দান করেছে যা তার কল্পনা বা ধারণাতেও ছিল না, তখন সে রাগ এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় এবং ত্বরিত সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে গিয়ে তার বাকপটুতা এবং (জ্বালাময়ী) কবিতার জোরে কুরাইশের হৃদয়ের সুপ্ত অগ্নিকে দাউদাউ করে জ্বালিয়ে তোলে, অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে। তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের রক্তের অতৃপ্ত পিপাসা জাগিয়ে তোলে, তাদের বক্ষ প্রতিশোধ ও শত্রুতার অগ্নিতে ভরে দেয়। কা'বের প্র জ্জ্বলিত অগ্নির কারণে যখন তাদের আবেগ-অনুভূতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে তখন সে তাদেরকে কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে কা'বাগৃহের পর্দা তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে এই শপথ আদায় করে যে, 'যতদিন ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করব ততদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব না'। মক্কাতেএমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার পর এই হতভাগা অন্যান্য গোত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের কাছে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষ জনকে উত্তেজিত করে। এরপর মদীনায় ফিরে এসে সে নিজের উত্তেজক কবিতায় চরম নোংরা ও অশ্লীলভাবে মুসলমান নারীদের (কথা) উল্লেখ করে। এমনকি নবী-পরিবারের সম্মানিত নারীদেরও নিজের নোংরা ও অশ্লীল কবিতার লক্ষ্যে পরিণত করতে দ্বিধা করে নি। আর দেশের সর্বত্র এসব কবিতা ছড়িয়ে বেড়ায়। অবশেষে সে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে আর কোনো নিমন্ত্রণ ইত্যাদির অজুহাতে তঁ াকে নিজের বাড়িতে ডেকে কতিপয় ইহুদী যুবকের হাতে তাঁকে হত্যা করানোর ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যথাসময়ে এই সংবাদ প্রকাশ পেয়ে যায় আর তার এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

বিষয়টি যখন এতদূর গড়ায় আর কা'বের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ, বিদ্রোহ, যুদ্ধের প্ররোচনা, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথাবার্তা আর হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপরাধ প্রমাণিত হয়, তখন মহানবী (সা.), যিনি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে সম্পাদিত সেই চুক্তি অনুযায়ী, যা তাঁর মদীনায় আগমনের পর মদীনাবাসীদের সাথে হয়েছিল, তিনি (সা.) মদীনার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন। (তাই) তিনি (সা.) এই রায় প্রদান করেন যে, কা'ব বিন আশরাফ নিজের অপকর্মের কারণে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য; এবং নিজের কয়েকজন সাহাবীকে নির্দেশ দেন যে, একে হত্যা করো। কিন্তু কা'বের সৃষ্ট নৈরাজ্যের কারণে তখন যেহেতু মদীনার পরিবেশ এমন হয়ে উঠছিল যে, তার বিরুদ্ধে রীতিমত ঘোষণা দিয়ে যদি তাকে হত্যা করা হতো তাহলে মদীনায় এক ভয়াবহ গৃহ-যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল, যার ফলে জানা নেই কতটা রক্তপাত ও প্রাণহানী ঘটতো। আর মহানবী (সা.) যেহেতু সকল সম্ভাব্য এবং বৈধ ত্যাগ স্বীকার করে হলেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে খুনোখুনি ও রক্তপাতকে বন্ধ করতে চাইতেন, (মুসলমান এবং ইহুদীরা যেন পরস্পর লড়াই করে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, পরস্পরের হাতে নিহত না হয়।) তাই তিনি (সা.) এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, কা'বকে প্রকাশ্যে (মানুষের সামনে) হত্যা না করে যথোপযুক্ত কোনো সময় বের করে কয়েক ব্যক্তিতাকে গোপনে হত্যা করবে। আর এই দায়িত্ব তিনি অওস গোত্রের নিষ্ঠাবান একজন সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)'র ওপর ন্যস্ত করেন এবং তাকে তাকিদপূর্ণ নির্দে শ দেন, যে রীতি-ই অবলম্বন করবে তা যেন অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)'র পরামর্শক্রমে করা হয়। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! গোপনে হত্যা করার জন্য তো কোনোকথা বলতে হবে; অর্থাৎ কোনো অজুহাত ইত্যাদি দেখাতে হবে, যার সাহায্যে কা'বকে তার বাড়ি থেকে বের করে কোনো নিরাপদ স্থানে নিয়ে তাকে হত্যা করা সম্ভব হবে। তিনি (সা.) সেই অসাধারণ ফলাফলকে দৃষ্টিপটে রেখে, যা এ ক্ষেত্রে নীরবে শাস্তি প্রদানের পন্থাকে পরিত্যাগ করলে সৃষ্টি হতে পারতো, এতে সম্মতি প্রদান করেন। কাজেই, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র পরামর্শক্রমে আবু নায়েলা এবং আরো দু'তিনজন সাহাবীকে নিজের সাথে নেন এবং কা'বের বাড়িতে পৌঁছেন এবং কা'বকে তার অন্দরমহল থেকে ডেকে বলেন, আমাদের সাহেব অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের কাছে সদকা বা আর্থিক কুরবানী চাচ্ছেন, কিন্তু আমরা অসচ্ছল; তুমি কি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে কিছু ঋণ দিতে পারো? একথা শুনে কা'ব আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় আর বলে, আল্লাহ্‌র কসম! এখনও কিছুই হয় নি। সেদিন দূরে নয় যখন তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তঁ াকে ছেড়ে দিবে। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)উত্তর দেন, আমরা তো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শিরোধার্য করেছি। এখন এই জামাতের পরিণাম কি হয় তা আমরা দেখব। কিন্তু তুমি বলো যে, ঋণ দিবে কি না? কা'ব বলে, হ্যাঁ, তবে আমার কাছে কোনো কিছু বন্ধক রাখতে হবে। অতঃপর প্রথমে সে নারীদের, এরপর পুত্রদের বন্ধক রাখার প্রস্তাব দেয়, [যেমনটি এখনই আমি বুখারীর বরাতে বর্ণনা করেছি।]অবশেষে অস্ত্র বন্ধক রাখার শর্তে কা'ব সম্মত হয়। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) এবং তার সাথিরা রাতে (আবার) আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে আসেন। রাত হতেই এই ছোট্ট দলটি সশস্ত্র হয়েকা'বের বাড়িতে পৌঁছে এবং তাকে বাড়ি থেকে বাইরে ডেকে কথা বলতে বলতে এক দিকে নিয়ে যায়, আর কিছুক্ষণ পর হাঁটতে হাঁটতে তাকে কাবু করে সেসব সাহাবী যারা পূর্বেই অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন, তরবারির আঘাত হানেন এবং তাকে হত্যা করেন। যাহোক, কা'ব নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মু হাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) এবং তার সাথিরা সেখান থেকে দ্রুত মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং তাঁকে এই হত্যার সংবাদ প্রদান করেন।

কা'বের নিহত হওয়ার সংবাদ জানাজানি হলে শহরে এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আরইহুদীরা চরমভাবে উত্তেজিত হয়ে যায়। পরের দিন প্রভাতে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থি ত হয় এবং অভিযোগ করে যে, আমাদের সরদার কা'ব বিন আশরাফকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি জানো, কা'ব কী কী অপরাধ করেছে? এরপর তিনি (সা.) সংক্ষিপ্ত পরিসরে কা'বের চুক্তি ভঙ্গ করা, যু দ্ধে প্ররোচিত করা, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথা বলা এবং হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি স্মরণ করান। তখন তারা ভয়ে চুপ হয়ে যায়। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের উচিত হবে অন্ততপক্ষে ভবিষ্যতে শান্তি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সহাবস্থান করা এবং শত্রুতা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন না করা। অতএব, ইহুদীদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন চুক্তি লেখা হয় আর ইহুদীরা নতুনভাবে মুসলমানদের সাথে শান্তি ও নিরাপদে থাকার এবং বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের রীতি পরিহারের অঙ্গীকার করে। আর এই অঙ্গীকারনামা হযরত আলী (রা.)'র দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়।

ইতিহাসে কোথাও এর উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, এরপর কখনো ইহুদীরা কা'ব বিন আশরাফের হত্যার উল্লেখ করে মুসলমানদের ওপর দোষারোপ করেছে। কেননা তাদের হৃদয় অনুভব করতযে, কা'ব নিজের (অপরাধের) উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

অতএব, সে যুগের প্রচলিত বিধান বা পদ্ধতি অনুযায়ী কা'বের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তাতে ইহুদীদের নীরব থাকা বলে দেয়- তারা এই শাস্তি ও এই পদ্ধতিকে স্বীকার করেছে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক পরবর্তীতে এই আপত্তি করে যে, মহানবী (সা.) একটি অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন এবং এটি ভুল কাজ ছিল। জেনে

রাখা উচিত যে, এটি অবৈধ হত্যাকাণ্ড ছিল না। কেননা কা'ব বিন আশরাফ মহানবী (সা.)-এর সাথে রীতিমতো শান্তি চুক্তি করেছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করা তো দূরের কথা , সে এই বিষয়ের অঙ্গীকার করেছিল যে, সে

প্রত্যেক বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করবে আর মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। এই অঙ্গীকার অনুযায়ী সে এ বিষয়টিও স্বীকার করেছিল, মদীনাতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, মহানবী (সা.) এর প্রধান হবেন এবং সব ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁর সিদ্ধান্ত সবার জন্য শিরোধার্য হবে। অতএব, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত এই চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীরা নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থাপন করত এবং তিনি (সা.) সে অনুযায়ী আদেশ জারি করতেন। এমতাবস্থায় কা'ব সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেছে, [সেগুলো উপেক্ষা করেছে, পালন করে নি।] মুসলমানদের সাথে বরং প্র কৃত অর্থে সমসাময়িক সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখানে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন নয়, সে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেননা মহানবী (সা.) রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। মদীনাতে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন করে এবং দেশে যুদ্ধের আগুন উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে, অধিকন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রগুলোকে ভয়ংকরভাবে ক্ষেপিয়ে তুলে। এরপর মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এসব কিছু এমন অবস্থায় করেছে যখন কিনা মুসলমানরা পূর্বে ই চতুর্দিক থেকে বিপদাপদে জর্জরিত ছিল,(সে) তাদের জন্য কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেয় আর এহেন অবস্থায় কা'বের অপরাধ বরংঅপরাধের সমষ্টি এরূপ ছিল না যে, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপগ্রহণ কোনো অযৌক্তিক কাজ গণ্য হবে। অতএব, এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আর অধুনাকালের তথাকথিত সভ্যদেশগুলোতে বিদ্রোহ, অঙ্গীকার ভঙ্গ, যুদ্ধের প্ররোচনা এবং হত্যা ষড় যন্ত্রের অপরাধে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাহলে আপত্তি কীসের? বরং বর্তমানে ফিলিস্তিন এবং ইসরাঈলের মাঝে যা কিছু হচ্ছে তা তো অনেক বেশি মাত্রায় হচ্ছে আর অনেক দিক থেকে (তা) বৈধও নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় আপত্তি হত্যারীতি সম্পর্কে।

তাকে গোপনে রাতের আঁধারে কেন হত্যা করা হয়েছে? এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে, সে সময় আরবে নিয়মতান্ত্রি ক কোনো সরকারব্যবস্থা ছিল না। একজন নেতা নির্বাচন করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কেবল তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মনে করা হতো না, বরং নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। সামগ্রিকভাবে কোনো সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিতে হলে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসত এবং নিজেদের পক্ষ থেকে গোত্রীয় সিদ্ধান্ত নিতে চইলে তারও ব্যবস্থা ছিল। এমতাবস্থায় এমন কোন আদালত ছিল যেখানে কা'বের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে রীতিমতো মৃত্যুদণ্ডাদেশ হস্তগত করা যেত? তার বিরুদ্ধে কি ইহুদীদের নিকট অভিযোগ করাসমীচীন ছিল, যাদের সে নেতা ছিল, বরং যারা কিনা নিজেরাই মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং প্র তিনিয়ত নৈরাজ্য সৃষ্টি করত? এ কারণে এই প্র শ্ন ই ওঠে না যে, ইহুদীদের কাছে যাওয়া যেত। সুলায়েম ও গাতফান গোত্রের কাছে সাহায্য চাওয়া যেত কি যারা কিনা বিগত কয়েক মাসে তিন-চারবার মদীনায় অতর্কিতে আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিল? [তারাও তার গোত্র ছিল।]কাজেই জানা কথা যে, তাদের কাছ থেকেও কোনো ন্যায়বিচার পাওয়া যেত না। যাহোক, সে সময়কার অবস্থার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করো এবং তারপর চিন্তা করে দেখো যে, এক ব্যক্তির উস্কানিমূলক কর্ম কাণ্ড, যুদ্ধের প্ররোচনা, নৈরাজ্য ছড়ানো ও হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে তার জীবনকে নিজের জন্য ও দেশের শান্তি র জন্য বিপজ্জনক দেখে আত্মরক্ষার মানসে সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করা ব্যতীত মুসলমানদের নিকট আর কোন পথ খোলা ছিল? কেননা অনেক শান্তি প্রিয় সাধারণ মানুষের জীবন বিপদাপন্ন হওয়া ও দেশের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার পরিবর্তে একজন দুষ্কৃতিকারী ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তির নিহত হওয়া অনেক উত্তম।

আল্লাহ্ তা'লাও এটিই বলেছেন, নৈরাজ্য হত্যার চেয়েও ভয়ংকর। যাহোক, হিজরতের পরে মুসলমান এবং ইহুদীদের মাঝে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছি ল সে অনুযায়ী মহানবী (সা.) একজন সাধারণ নাগরিকের মর্যাদা রাখতেন না, বরং তিনি সেই প্রজাতন্ত্রের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন যা মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এবং রাজনৈতিক বিষয়াদিতে যে সিদ্ধান্ত তিনি উপযুক্ত মনে করতেন তা জারি করার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

অতএব, তিনি (সা.) যদি দেশের শান্তি র স্বার্থে কা'বের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন , তবে এতে আহামরি কোনো সমস্যা ছিল না, (অতএব) এ কারণে তেরশ' বছর পর অধুনাকালের প্রাচ্যবিদরা ইসলামের ওপর যে আপত্তি উত্থাপন করছে তা অর্থহীন, কেননা সে সময় ইহুদীরা তাঁর (সা.) কথা শুনে কোনো আপত্তি করে নি।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৬৬-৪৭২)

এ সময়েই হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)'রও বিয়ে হয়, (তার) দ্বিতীয় বিয়ে। হযরত হাফসা (রা.) হযরত উমর (রা.)'র কন্যা ছিলেন এবং তার সাথে মহানবী (সা.)-এর বিয়ের বিষয়ে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার বিবরণ হলো, হযরত হাফসা (রা.)'র স্বামী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এরপর মহানবী (সা.) হযরত হাফসা (রা.)-কে বিয়ে করেন। এর বিশদ বিবরণ বুখারীতে এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে-হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হযরত খুনায়েস বিন হুযাফা (রা.)'র সংসারে বিধবা হন; তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রেওয়ায়েতে এসেছে, মদীনায় যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করি। তাঁর কাছে হযরত হাফসার কথা বলি এবং প্রস্তাব দিই, আপনি যদি চান তাহলে হাফসা বিনতে উমরকে আপনার সাথে বিয়ে দিব। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করব। হযরত উমর (রা.) বলেন, অতঃপর আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করি। হযরত উসমান (রা.) কয়েকদিন পর বলেন, বর্তমানে আমি বিয়ে না করাটাই সমীচীন বলে মনে করছি। হযরত উমর (রা.) বলেন,এরপর আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে যাই এবং বলি, আপনি যদি চান তাহলে আমি হযরত হাফসা বিনতে উমরকে আপনার সাথে বিয়ে দিব। হযরত আবু বকর (রা.) নীরব থাকেন এবং আমাকে কোনো উত্তর দেন নি। হযরত উমর (রা.) বলেন, উসমানের চেয়ে আমি তার কাছ থেকে বেশি (কষ্ট) অনুভব করলাম অর্থাৎ বেশি (কষ্ট) অনুভব হলো যে, তিনিও নাকচ করে দিলেন। তিনি (রা.) বলেন, এরপর আমি কিছুদিন অপেক্ষা করি। তারপর মহানবী (সা.) হযরত হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব প্রেরণ করেন এবং আমি তঁ ার (সা.) সাথে তাকে বিয়ে দিই। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০০৫)

সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে এ ঘটনাটি এভাবে লেখা আছে,হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র একজন কন্যা ছিলেন যার নাম হাফসা। তিনি খুনায়েস বিন হুযাফা'র স্ত্রী ছিলেন, যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরত আসার পথে খুনায়েস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থতা হতে আর প্রাণরক্ষা হয়নি। তার মৃত্যুর কিছুকাল পর হযরত উমর (রা.) হাফসার বিয়ে নিয়ে চিন্তিত হন। সে সময় হাফসার বয়স বিশ বছরের বেশি ছিল। হযরত উমর (রা.) স্বীয় প্রকৃতিগত সারল্য থেকে নিজেই হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বলেন, আমার মেয়ে হাফসা বর্তমানে বিধবা। আপনি যদি পছন্দ করেন তাহলে তাকে বিয়ে করতে পারেন কিন্তু হযরত উসমান (রা.) নাকচ করে দেন। এরপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে একথা বলেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)ও নীরবতা পালন করেন এবং কোনো উত্তর দেন নি। এতে হযরত উমর (রা.) ভীষণ কষ্ট পান এবং তিনি সেই কষ্ট নিয়েই মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থি ত হয়ে তাঁর সাথে সব কথা খুলে করেন। তিনি (সা.) বলেন, উমর!কোনো চিন্তা কোরো না। খোদা তা'লা চাইলে হাফসা, উসমান এবং আবু বকরের চেয়েও উত্তম স্বামী পাবে আর উসমান, হাফসার চেয়ে উত্তম স্ত্রী পাবে।

তিনি (সা.) একথা এ কারণে বলেছিলেন যে, তিনি হাফসাকে বিয়ে করার এবং নিজের মেয়ে উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমান (রা.)'র সাথে বিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেছিলেন, যা হযরত আবু বকর এবং উসমান উভয়ে জানতেন আর এ কারণেই তারা হযরত উমর (রা.)'র প্রস্তাব নাকচ করেছিলেন। এর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)'র কাছে তঁ ার কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেন এবং এরপর তিনি (সা.) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে হযরত উমর (রা.)-কে হাফসার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.)' র এর চেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে? তিনি (রা.) পরমানন্দে এ প্রস্ত াব গ্রহণ করেন এবং ৩য় হিজরীর শা'বান মাসে হযরত হাফসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের অন্তর্ভু ক্ত হন। এ বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আপনি হয়ত আমার পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট পেয়েছেন।আসলে আমি মহানবী (সা.)-এর সংকল্প সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম, কিন্তু আমি তাঁর (সা.) অনুমতি ব্যতীত তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারতাম না। এটা সত্য, তাঁর (সা.) যদি এই সংকল্প না থাকত তাহলে আমি সানন্দে হাফসাকে বিয়ে করতাম।

হাফসার বিয়ের একটি অসাধারণ বিশেষত্ব এটি ছিল যে, তিনি হযরত উমর (রা.)'র কন্যা ছিলেন, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র পর সকল সাহাবীর মাঝে সর্বোত্তম বলে পরিগণিত হতেন এবং মহানবী (সা.)-এর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন ছিলেন। অতএব, পারস্পরিক সম্পর্ককে অধিক সুদৃঢ় করতে এবং হযরত খুনায়েস বিন হুযাফার অকাল মৃত্যুতে হযরত উমর এবং হযরত হাফসা যে দুঃখ পেয়েছিলেন সেই দুঃখ দূর করার জন্য মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত হাফসাকে বিবাহ করাকে সঙ্গত মনে করেন আর অপর যে প্রজ্ঞাটি দৃষ্টিতে ছিল তা হলো, মহানবী (সা.)-এর যত বেশি সহধর্মিণী থাকবে ততই নারীদের মাঝে, যারা

মানবজাতির অর্ধাংশ, বরং অনেক দিক থেকে উত্তমার্ধ, (তাদের দ্বারা) তবলীগ ও তালীমের কাজ আরো ব্যাপক পরিসরে এবং অতি সহজে ও সুন্দরভাবে করা সম্ভব হবে।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা–মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৪৭৭–৪৭৮)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরও বলেন, বিবাহের সময় হযরত হাফসা(রা.)'র বয়স ছিল প্রায় ২১ বছর আর হযরত আয়েশা (রা.)'র পর সাহাবীদের মাঝে তিনি যেহেতু সর্বোত্তম এক ব্যক্তির কন্যা ছিলেন, তাই মহানবী (সা.)–এর পবিত্র সহধর্মিণীদের মাঝে তাঁর এক বিশেষ মর্যাদা ছিল আর হযরত আয়েশা (রা.)'র সাথেও তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল; টুকটাক কিছু টানাপোড়েন ছাড়া, যা এমন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটেই থাকে, তারা উভয়ে পরস্পর মিলেমিশে থাকতেন। হযরত হাফসা (রা.) লেখাপড়া জানতেন। হাদীসে একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, তিনি একজন মহিলা সাহাবী শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ্‌র কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তিনি উনচল্লিশ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন যখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬৩ বছর।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা–মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৪৮০)

এরপর এই সময়ের মধ্যেই হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র জন্ম হয়। হযরত ইমাম হাসান বিন আলী বিন আবু তালেব রমযানের মধ্যভাগে তৃতীয় হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে বলেন, তৃতীয় হিজরীর শা'বান মাসে তাঁর জন্ম হয়। আবার অনেকে বলেন, উহুদের যুদ্ধের এক বছর পর তাঁর জন্ম হয়, আবার অনেকের মতে দুই বছর পর হয়। বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, প্র থমোক্ত মত সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও সঠিক। হযরত আলী (রা.) তাঁর নাম রাখেন হারব, কিন্তু মহানবী (সা.) সেই নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন হাসান। জন্মের সপ্তম দিনে তিনি (সা.) তার আকীকা দেন এবং তার মাথার চুল কামিয়ে দেন এবং আদেশ দেন যে, তার চুলের সমপরিমাণ রুপা যেন দানখয়রাত করা হয়। একদা উম্মে ফযল নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আপনার একটি অঙ্গ আমার গৃহে অথবা আমার কক্ষে। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছ। ফাতেমার গর্ভে এক সন্তান জন্ম নিবে, তুমি তার দেখাশোনা করবে এবং তুমি তাকে কুসুমের সাথে দুধ পান করাবে। উম্মে ফযল মহানবী (সা.)–এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)'র সহধর্মিণী ছিলেন এবং তার ছেলের নাম ছিল কুসুম। অতএব, হযরত হাসান (রা.) জন্মগ্রহণ করেন এবং উম্মে ফযল তাকে কুসুমের সাথে দুধ পান করান।

হযরত হাসান বিন আলী (রা.)'র কাছে নিবেদন করা হয় যে, মহানবী (সা.)–এর কোনো কথা আপনার স্মরণ আছে কি? থাকলে বলুন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)–এর একটি কথা আমার স্মরণ আছে। আমি একবার সদকার খেজুরের মধ্য থেকে একটি খেজুর নিয়ে আমার মুখে দেই। তা দেখে মহানবী (সা.) আমার মুখ থেকে সেটি বের করে ফেলেন, এমতাবস্থায় যে সেটিতে আমার মুখের লালা লেগে ছিল; এবং তিনি সেটিকে সদকার খেজুরের সাথে মিলিয়ে ফেলেন। কেউ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! একটি খেজুর খেলে সমস্যা কী?

মহানবী (সা.) বলেন, আমাদের জন্য অর্থাৎ আলে মুহাম্মদ (সা.)–এর জন্য সদকা হালাল নয়।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হাসানের চেয়ে বেশি মহানবী (সা.)–এর কেউ সদৃশ ছিলেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) হযরত হাসান (রা.)–কে নিজের কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। (তখন) কেউ বলে, হে রাজপুত্র! তুমি কতই না উত্তম আরোহীর ওপর আরোহণ করেছ! মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, এই আরোহণকারীও তো উত্তম। তিনি (সা.) তাঁর দৌহিত্রকে অনেক ভালোবাসতেন।

হযরত বারা' (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)–কে দেখেছি, তিনি (সা.) হযরত হাসান বিন আলী (রা.)–কে নিজের কাঁধে তুলে রেখেছিলেন আর একথা বলছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌!আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তার প্রতি ভালোবাসা রেখো। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে একথারও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র মৃত্যু বিষ প্রয়োগে হয়েছিল।

(আল আসাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯২) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড,পৃ: ১৩–১৬)

যাহোক, হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র জন্মের উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, দ্বিতীয় হিজরীর বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতেমা (রা.)'র বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় হিজরী সনের রমযান মাসে অর্থাৎ বিয়ের দশ মাস পর তাদের পরিবারে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন যার নাম মহানবী (সা.) হাসান রেখেছেন। ইনি সেই হাসান যিনি পরবর্তীতে মুসলমানদের মাঝে ইমাম হাসান আলাইহের রহ্‌মত উপাধি লাভ করেন। হযরত হাসান (রা.) আকার–আকৃতি ও অবয়বের দিক থেকে মহানবী (সা.)–এর সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্য রাখতেন। মহানবী (সা.) যেভাবে তাঁর সন্তান হযরত ফাতেমা (রা.)–কে ভীষণ ভালোবাসতেন, অনুরূপভাবে হযরত ফাতেমা (রা.)'র সন্তানদের প্রতিও তাঁর বিশেষ ভালোবাসা ছিল। অনেকবার তিনি (সা.) বলেছেন, হে খোদা! আমি এই শিশুদের ভালোবাসি, তুমিও এদের ভালোবাসো এবং যারা এদেরকে ভালোবাসবে তুমি তাদেরকেও ভালোবেসো।

অনেকবার এমন হয়েছে যে, মহানবী (সা.) নামাযরত থাকতেন আর হাসান (রা.) তাঁকে আঁকড়ে ধরতেন, রুকু করার সময় তাঁর দু পায়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা বানিয়ে বেরিয়ে যেতেন। কখনো কখনো সাহাবীরা তাকে থামাতে চাইলে তিনি (সা.) সাহাবীদের বারণ করতেন যে, তাকে বাধা দিও না। প্রকৃতপক্ষে যেহেতু তার (ইমাম হাসান) এভাবে আঁকড়ে থাকার ফলে তাঁর (সা.)–এর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটতো না তাই তিনি (সা.) তার নিষ্পাপ ভালোবাসার শিশুসু লভ প্রকাশের মাঝে বাধ সাধতে চান নি। ইমাম হাসান (রা.) সম্পর্কে একবার মহানবী (সা.) বলেন, আমার এই সন্তান সৈয়্যদ অর্থাৎ নেতা এবং এমন এক সময় আসবে যখন খোদা তা'লা তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি দলের মাঝে সন্ধি বা মীমাংসা করাবেন। অতএব, যথাসময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা–মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৮০–৪৮১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার মতে হযরত হাসান (রা.) খুবই ভালো কাজ করেছেন যে, খিলাফতের (দায়িত্ব) থেকে সরে গিয়েছেন। পূর্বেই সহস্র সহস্র প্রাণহানী ঘটেছে;আরো রক্তপাত ঘটুক– এটি তিনি পছন্দ করেন নি, তাই (তিনি) মুআ'বিয়ার কাছ থেকে ভাতা নিয়ে নেন। যেহেতু হযরত হাসান (রা.) এই সন্ধি করেন (তাই) হযরত হাসানের এ কাজের কারণে শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত আসে। একারণে (তারা) হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র প্রতি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারে নি। আমরা তো উভয়ের গুণকীর্তন করি (অর্থাৎ হযরত হাসানেরও এবং হযরত হুসাইনেরও।) প্রকৃত বিষয় হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির প্র কৃতি বা স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। হযরত ইমাম হাসান (রা.) এটি পছন্দ করেন নি যে, মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হোক এবং রক্তপাত ঘটুক। তিনি (রা.) শান্তিপ্রতিষ্ঠাকে দৃষ্টিপটে রাখেন। 'নরাধম পাপীষ্ঠের হাতে বয়আত গ্রহণ করা' হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) পছন্দ করেন নি, কেননা এতে ধর্মের মাঝে বিকৃতি দেখা দেয়। উভয়ের উদ্দেশ্য সৎ ছিল। 'ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত' (নিশ্চয় সংকল্পের ওপর কর্মফল নির্ভর করে)।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৭৮–২৭৯)

এই ছিল তাদের সন্তানদের ঘটনা।

যেমনটি আমি বিগত কয়েক খুতবায় ফিলিস্তিনবাসীর জন্য দোয়ার অনুরোধ করছি, আজও এ সম্পর্কে বলতে চাই। দোয়া অব্যাহত রাখুন। এখন তো অত্যাচার–নিপীড়ন চরম সীমায় উপনীত হচ্ছে। হামাসের সাথে যুদ্ধের অজুহাতে নিষ্পাপ শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অসুস্থদের হত্যা করা হচ্ছে। যুদ্ধের সকল রীতিনীতিকে এই তথাকথিত সভ্য সমাজ উপেক্ষা করছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান রাষ্ট্রগুলোকে বিবেক–বুদ্ধি দিন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বাহাত্তর–তিয়াত্তর বছর পূর্বে সর্তক করেছিলেন যে, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক, একে একে নিজেদেরকে ধ্বংস করবে নাকি একাত্ম হয়ে নিজেদের ঐক্য বহাল রাখবে এবং প্রতিষ্ঠিত থাকবে।কারণ যদি তারা ঐক্যবদ্ধ না হয় তবে এক এক করে ধ্বংস হবে। হায় পরিতাপ! আজও যদি এই লোকেরা এই কথা অনুধাবন করে ঐক্যবদ্ধ হতো!

অবস্থা তো এমন যে, কেউ আমাকে বলেছে, যারা উমরা করতে যাচ্ছে তাদের বলা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে ফিলিস্তিন বা ইসরাঈলের যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো কথা বলা যাবে না। সেখানকার প্রশাসন ভিসা দেওয়ার সময় এই নির্দেশনা প্রদান করছে। যদি একথা সত্য হয় তবে এক মুসলমান রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটি হবে চরম ভীরুতা প্রদর্শন। যাহোক, উমরার ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিত। এই (ইবাদতের) সময় নিঃসন্দেহে এমন কোনো কথা বলা হবে না, কিন্তু নির্যাতিত ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য অবশ্যই দোয়া করা উচিত। হায়! যারা (উমরাতে) যাচ্ছেন তারা যদি এই দোয়াকেও স্মরণ রাখতো!

বর্তমানে মুসলমান রাষ্ট্রগুলোও সামান্য আওয়াজ তুলছে, তবে খুবই ক্ষীণ আওয়াজ উঠছে। এরচেয়ে তীব্র আওয়াজ তো কোনো কোনো অমুসলমান ব্যক্তি, বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রও উত্তোলন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের মাঝেও সাহস এবং প্রজ্ঞা সৃষ্টি করুন।

জাতিসংঘের মহাসচিবও জোরালো কথা বলেন, আজকাল তো আরো বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলছেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, তার কথার কোনো গুরুত্ব নেই। মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অথবা এই যুদ্ধের যদি আরও বিস্তৃতি ঘটে এবং বিশ্ব যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে তবে জাতিসংঘেরও অবসান ঘটবে। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে বিবেক–বুদ্ধি দান করুন।

মনে হচ্ছে, এখন পৃথিবী নিজের ধ্বংসকে নিকটতর করছে। আর এই ধ্বংসযজ্ঞের পর যারা বেঁচে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক–বুদ্ধি দিন, তারা যেন খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং তাঁর দিকে (যেন) ফিরে আসে। যাহোক, আমাদের এ প্রেক্ষিতে অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীর প্রতি কৃপা করুন। (আমীন)

****

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাসমগ্র এবং অমৃতবাণীর অগণিত স্থানে স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্য এবং এই যুগে কোনো সংস্কারকের আগমনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন।

আসল কথা হলো, কোনো ব্যক্তির নবুয়্যতের দাবির প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম যুগের চাহিদা বা প্রয়োজনকে দেখা হয়। এরপর এটিও দেখা হয় যে, সে নবীদের (আবির্ভাবের) জন্য নির্ধারত সময়ে এসেছে কি না? এছাড়া এটিও প্রণিধান করা হয় যে, খোদা তা'লা তাকে সাহায্য করেছেন কি না? এরপর এটিও দেখতে হয় যে, শত্রুরা যেসব আপত্তি তুলেছে সেসব আপত্তির যথার্থ উত্তর দেওয়া হয়েছে কি না? এই সমস্ত বিষয় যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন মানতে হবে যে, সেই ব্যক্তি সত্য, নতুবা নয়।

নিঃসন্দেহে এক ঐশী সংস্কারকের প্রয়োজন, যিনি পুনরায় দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে ঈমানের শিকড়গুলোতে পানি সিঞ্চন করবেন আর এভাবে মন্দ ও পাপ থেকে মুক্ত করে পুণ্য ও সাধুতার প্রতি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জামা'তের সদস্যদের ঈমানকে আল্লাহ্ তা'লা সুদৃঢ় করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। অতএব, আজও আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের যে দৃশ্যাবলী অবলোকন করছি এগুলো একজন আহমদীর জন্য ঈমানের দৃঢ়তার কারণ।

প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয়টিকেওবুঝতে হবে যে, শুধুমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবিকে মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং আমাদেরকে নিজেদের মাঝে সেসব পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে যা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ হবে। যা মহানবী (সা.) এর সুন্নতের পথে পরিচালিত হওয়ার ব্যবহারিক চিত্র হবে। আর যখন এমনটি হবে তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারীও হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ্যও দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৪ নভেম্বর, , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২৪ নবুয়ত ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাসমগ্র এবং অমৃতবাণীর অগণিত স্থানে স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্য এবং এই যুগে কোনো সংস্কারকের আগমনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন।

(আর) এটি প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর আগমন একান্ত সময়ের প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে ছিল। আর আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা রীতি এবং মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ছিল। অতএব তিনি (আ.) বলেন, দলিল পূর্ণ করার লক্ষ্যে আমি একথা প্রকাশ করতে চাই যে, খোদা তা'লা এ যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পেয়ে, আর বিশ্বকে উদাসীনতা, কুফর এবং শিরকে নিমজ্জিত দেখে, অধিকন্তু ঈমান ও সততা এবং তাকওয়া আর সাধুতাকে হারিয়ে যেতে দেখে আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি পুনরায় পৃথিবীতে সেই জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক এবং নৈতিক আর ঈমানের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যেন ইসলামকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন যারা দর্শন ও প্রকৃতিবাদ এবং (অবৈধকে) বৈধ করে নেওয়া আর শিরক এবং নাস্তিকতার পোশাকে এই ঐশী বাগানের কোনো ক্ষতি করতে চায়। অতএব, হে সত্যের সন্ধানীরা! প্রণিধান করে দেখো! এটিই কি সেই সময় নয় যাতে ইসলামের জন্য ঐশী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। এখনও কি তোমাদের কাছে এটি প্রমাণিত হয়নি যে, বিগত শতাব্দীতে, যেটি ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল, ইসলামের ওপর কোন্ কোন্ বিপত্তি এসেছে আর ভ্রষ্টতা ছেয়ে যাওয়ার কারণে কোন্ কোন্ অসহনীয় আঘাত আমাদের সইতে হয়েছে। তোমরা কি এখনও অবগত হওনি যে, কোন্ কোন্ বিপদ ইসলামকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তোমরা কি এখনও এই সংবাদ পাওনি যে, কত পরিমাণ মানুষ ইসলাম ছেড়ে গেছে, কত (মানুষ) খ্রিষ্টধর্মে যোগ দিয়েছে, কত (মানুষ) নাস্তি ক ও প্রকৃতিবাদী হয়ে গেছে, আর অংশীবাদিতা ও বিদআত কত ব্যাপক পরিসরে তৌহীদ ও সুন্নতের জায়গা দখল করে নিয়েছে আর ইসলামকে প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্যে কত বইপুস্তক রচনা এবং পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব এখন তোমরা চিন্তা করে বলো, এটি কি আবশ্যক ছিল না যে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই শতাব্দীতে এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হতো যিনি বহিঃআক্রমণের মোকাবিলা করতেন? যদি প্রয়োজন থেকে থাকে তাহলে তোমরা জেনেশুনে (এই) ঐশী নিয়ামতকে অস্বীকার কোরো না এবং সেই ব্যক্তির প্রতি বিদ্রোহী হয়ে যেও না- যাঁর আগমন এই শতাব্দীতে, এই শতাব্দীর অবস্থার নিরিখে আবশ্যক ছিল আর শুরু থেকেই মহানবী (সা.) যার সংবাদ দিয়েছিলেন।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫১-২৫৩)

এরপর তিনি (আ.) কোনো আগমনকারীর সত্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ডের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

কোনো ব্যক্তিকে সত্য বলে গ্রহণের জন্য এটি আবশ্যক নয় যে, কোনো ঐশী গ্রন্থে তাঁর সুস্পষ্ট সংবাদও থাকতে হবে। এই শর্ত অপরিহার্য হলে কোনো নবীর নবুয়্যতই প্রমাণিত হবে না।

আসল কথা হলো, কোনো ব্যক্তির নবুয়্যতের দাবির প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম যুগের চাহিদা বা প্রয়োজনকে দেখা হয়। এরপর এটিও দেখা হয় যে, সে নবীদের (আবির্ভাবের) জন্য নির্ধারত সময়ে এসেছে কি না? এছাড়া এটিও প্রণিধান করা হয় যে, খোদা তা'লা তাকে সাহায্য করেছেন কি না? এরপর এটিও দেখতে হয় যে, শত্রুরা যেসব আপত্তি তুলেছে সেসব আপত্তির যথার্থ উত্তর দেওয়া হয়েছে কি না? এই সমস্ত বিষয় যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন মানতে হবে যে, সেই ব্যক্তি সত্য, নতুবা নয়।

এখন এটি সুস্পষ্ট যে, যুগ স্বীয় অবস্থার আলোকে ফরিয়াদ করছে যে, এখন ইসলামী মতভেদ দূর করার লক্ষ্যে এবং বহিঃআক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আধ্যাত্মিকতাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিঃসন্দেহে এক ঐশী সংস্কারকের প্রয়োজন, যিনি পুনরায় দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে ঈমানের শিকড়গুলোতে পানি সিঞ্চন করবেন আর এভাবে মন্দ ও পাপ থেকে মুক্ত করে পুণ্য ও সাধুতার প্রতি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

অতএব, একান্ত প্রয়োজনের সময় আমার আগমন এরূপ সুস্পষ্ট যে, আমি ধারণা করতে পারি না যে; চরম বিদ্বেষী ছাড়া অন্য কেউ এটি অস্বীকার করতে পারে। আর দ্বিতীয় শর্ত, অর্থ াৎ এটি দেখা যে, নবীদের (আগমনের) জন্য নির্ধারিত সময়ে আগমন হয়েছে কি-না? এই শর্তও আমার আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। কেননা নবীরা এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যখন ষষ্ঠ সহস্রাব্দ শেষ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসবে তখন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ আবির্ভূত হবেন। অতএব, চান্দ্র (মাসের) হিসেব অনুযায়ী ষষ্ঠ সহস্রাব্দ, যা হযরত আদমের আবির্ভাবের সময় থেকে গণনা করা হয়, দীর্ঘদিন পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে আর সৌর (বর্ষের) হিসেব অনুযায়ী ষষ্ঠ সহস্রাব্দ শেষ হওয়ার পথে। (অর্থাৎ, তা-ও হয়ে গেছে)। এছাড়া আমাদের নবী (সা.) একথা বলেছিলেন যে, 'প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে একজন মুজাদ্দিদ আসবেন, যিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন' আর এখন এই চতুর্দশ শতাব্দীরও একুশ বছর পার হয়ে গেছে। {তিনি (আ.) যখন বলছিলেন, এটি সে সময়ের কথা}এবং বাইশতম বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। এখন এটি (কি) একথার নিদর্শন নয় যে, সেই মুজাদ্দিদ এসে গেছেন।"

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ১৯৪-১৯৫)

অ-আহমদীরা মানুক বা না মানুক, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু এটি তো এখন

তারা নিজেরাও ডেকে ডেকে বলছে আর সর্বত্র একথা বলা হচ্ছে যে, (এখন) ইসলামে কোনো মাহদী এবং সংস্কারকের প্রয়োজন, যিনি ইসলামের তরির হাল ধরবেন। কিন্তু যিনি আগমনকারী এবং সেসব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যিনি সময়ের চাহিদা অনুসারে এসেছেন- তাঁকে মানতে তারা প্রস্তুত নয়।

একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শুধু দাবিই করেননি বরং নিজের সত্যতার সমর্থনে অগণিত নিদর্শনও উপস্থাপন করেছেন। এখানে সেসব (নিদর্শনের সব) উল্লেখ করা সম্ভব নয়, সুতরাং একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, 'একটি সুমহান নিদর্শন হলো, আজ থেকে তেইশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া (গ্রন্থে) এই এলহাম সংরক্ষিত আছে যে, মানুষ এই জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চেষ্টা করবে আর (এজন্য) সকল ষড়যন্ত্র প্রয়োগ করবে, কিন্তু আমি এই জামা'তকে বর্ধি ত করব এবং পরিপূর্ণ করব আর তা একটি সেনাদলে পরিণত হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রাধান্য থাকবে এবং আমি তোমার নামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি দান করব আর দূরদূরান্ত হতে দলে দলে মানুষ আসবে এবং সবদিক থেকে আর্থিক সাহায্য আসবে। গৃহগুলোকে প্রশস্ত করো, কেননা উর্ধ্বলোকে এর প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেন, এখন (ভেবে) দেখো! এটি কোন্ যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যা আজ পূর্ণ হয়েছে। এগুলো খোদার নিদর্শন যা চক্ষুষ্মানরা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু যারা অন্ধ তাদের মতে এখনও কোনো নিদর্শন প্রকাশ পায়নি।"

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৩৮৪-৩৮৫)

আজও আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের এই জামা'তে যোগদান করা, কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া তাঁর (আ.) সত্যতারই প্রমাণ। আজ পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে তাঁর (আ.) বাণী পৌঁছেনি, যেখানে তাঁর বাণীর কল্যাণে সদাত্মাদের ইসলামের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়নি এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং কোনো কোনো স্থানে এমন এমন ঘটনা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের পথপ্রদর্শন করেছেন এবং তারা জামা'তে যোগদান করেছে।

বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জামা'তের সদস্যদের ঈমানকে আল্লাহ্ তা'লা সুদৃঢ় করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। অতএব, আজও আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের যে দৃশ্যাবলী অবলোকন করছি এগুলো একজন আহমদীর জন্য ঈমানের দৃঢ়তার কারণ। এখন আমি (আপনাদের সামনে) কতক মানুষের বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করতে চাই।

বাবায়ু ইসলাম বেক সাহেব একজন রাশিয়ান। তিনি কিরগিজস্তান এর অধিবাসী। তিনি বলেন, আমার সম্পর্ক হলো কিরগিজস্তান এর কাশগর কিসলাক এর সাথে। তিনি আরও বলেন, আমার পত্র লেখার কারণ হলো, আমি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বয়আত করে প্রকৃত ইসলাম অর্থাৎ (আহমদীয়া) জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ হলো, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ইসলামের গুণাবলিকে অতি উন্নতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, কেবল ইমাম মাহদীই এভাবে ইসলামের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারেন। এরপর তিনি লিখেন, আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মুত্তাকী বানিয়ে দেন আর বয়আতের দশটি শর্ত পালনকারী করেন। এ হলো দূরদূরান্তের অঞ্চলে বসবাসকারী এক ব্যক্তির বর্ণনা। আর এটি শুধু এক স্থানের কথা নয়, বরং প্রতিটি দেশেই একই অবস্থা।

কঙ্গোর একটি প্রদেশ হলো মানিমা। সেখানকার একটি স্থান হলো রোদিকা। একজন খ্রিষ্টান বন্ধু হলেন ফিরোজ মাজেক সাহেব। তার কাছে জামা'তের লিফলেট পৌঁছে , যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন এবং আহমদীয়া জামা'তে খিলাফত ব্যবস্থাপনার নিয়ামতের কথা উল্লেখ ছিল। সেটি পড়ে তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তিনি বলেন, আমি তো এই ইসলামেরই সন্ধানে ছিলাম। তিনি বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্ত র্ভুক্ত হয়ে যান। অনুরূপভাবে আরেকজন বন্ধু হোসেন সাহেবও জামা'তের লিফলেট পড়ে কেবল বয়আতই করেননি, বরং এরপর তিনি তবলীগ করাও আরম্ভ করেন। আর তার তবলীগেই তখন পর্যন্ত, যখন এই রিপোর্ট এসেছিল, পাঁচজন লোককে তিনি আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। অতএব এভাবে মানুষ কেবল নিজেরাই (জামা'তের) অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না, বরং তবলীগও করছে। আর এটি পুরোনো আহমদীদের জন্যও চিন্তার সময় যে, তাদেরও তবলীগের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

এরপর তানজানিয়ার একটি অঞ্চল হলো শিয়াঙ্গা। সেখানকার একটি জামা'ত হলো মোঙ্গালাঙ্গা। এই জামা'তে যখন আহমদীয়াতের সূচনা হয় তখন শুরুতে আহমদীরা গাছের ছায়ায় নামায পড়তো। এরই মাঝে সেখানে এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ফুঙ্গুঙ্গা জামা'তের প্রচণ্ড বিরোধিতা আরম্ভ করে আর কতিপয় ব্যক্তির সাথে মিলে এই অপপ্র চার করে যে, এই আহমদীরা তো মুসলমানই নয়। আর আমরা মুসলমানরা খুব শীঘ্র এখানে মসজিদ নির্মাণ করব। উক্ত ব্যক্তি একজন স্বচ্ছল মহিলার কাছ থেকে এই নিশ্চয়তাও গ্রহণ করে যে, সে মসজিদের জন্য অর্থ সরবরাহ করবে। অপরদিকে যখন একজন নিষ্ঠাবান আহমদী রমজান সাহেব নিজ জমি মসজিদের জন্য ওয়াকফ বা দান করেন তখন সেই ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করে যেন কোনোভাবে এই জমিটি অ-আহমদী মুসলমানরা পেয়ে যায়। কিন্তু সেই আহমদী অবিচল থাকেন। এমনকি জামা'তের মসজিদের নির্মাণ-কাজ আরম্ভ হয় আর তা পূর্ণও হয়ে যায়। এরই মাঝে আহমদীয়া জামা'তের তবলীগ সেই বিরোধী ব্যক্তির ঘরেও পৌঁছে যায়। একদিকে সে বিরোধিতা করছে আর অপরদিকে তার ঘরেও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লা তার স্ত্রী ও সন্তানদের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন।এখন সে নিজ বিরোধিতায় একা রয়ে গেছে। এখন যদি এই ব্যক্তির জ্ঞান থাকে আর তার ন্যায় আরও বহু লোক রয়েছে, তাহলে তাদের জন্য এই নিদর্শনই যথেষ্ট যে, বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তার স্ত্রী-সন্তানদের হৃদয়ে প্রকৃত ইসলামের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন আর তার কোনো জোর খাটেনি। এরূপ ঈমান আর এরূপ পরিবর্তন কি কোনো মানুষ সৃষ্টি করতে পারে? কখনোই না। এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহেই হয়ে থাকে।

এরপর ঈমানের দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনের আরেকটি উদাহরণ রয়েছে।

আর্জেন্টিনা, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি এলাকা। আমেরিকার অঞ্চল এটি। একটি ছিল আফ্রিকার, আরেকটি ছিল রাশিয়ার। আর এটি হলো আমেরিকার। সেখানকার একজন নারী হলেন মেরিলা সাহেবা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থার কারণে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ, তখনও তিনি আহমদী হননি, কেবল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত মহিলার পরিচয় যখন আহমদীয়া জামা'তের সাথে ঘটে আর তিনি আমাদের প্রচারকেন্দ্রে এসে আরবী ও ইসলাম ক্লাসে অংশ নিতে থাকেন, এর কয়েক মাস পর তিনি বয়আত করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তিনি বলেন, বয়আত করে আমি প্রশান্তি লাভ করেছি, কেননা আমি জামা'তের শিক্ষামালা এবং আমল বা কর্মের মাঝে সাদৃশ্য পেয়েছি আর প্রকৃত ভ্রাতৃত্বে র পরিবেশ অনুভব করেছি।

এখানে প্রত্যেককে,তা সে নবদিক্ষিত হলেও, সেবার সুযোগ দেওয়া হয় আর কোনো প্রকার ভেদাভেদ নেই । তার কন্যা, যে কিনা অমুসলিম, সে সুন্নী ইসলামিক সেন্টারে, যা তাদের একটি উচ্চবিদ্যালয় এবং আরবরা যেখানে অর্থ ব্যয় করেছে, সেখানে পড়াশোনা করছিল। স্কুলপ্রশাসন যখন তার মায়ের (আহমদীয়া) জামা'ত গ্রহণের কথা জানতে পারে তখন তার ওপর চাপ প্রয়োগ আরম্ভ করে আর জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করতে থাকে। স্কুল প্রশাসন যখন জানতে পারে যে, তার কন্যা নিজ স্কুলের প্রজেক্টের অধীনে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় জামা'তের প্রচার কেন্দ্রের জন্য সাজসজ্জার বিশেষ সামগ্রী প্রস্তুত করেছে তখন স্কুল প্রশাসন খুবই অসন্তুষ্ট হয়। আর সেই মেয়েকে বলে যে, আহমদীয়া জামা'তের সমর্থন করলে তোমার জন্য স্কুলে সমস্যা হবে তাই তুমি এবং তোমার মা জামা'ত ছেড়ে দাও। যখন তার মা একথা জানতে পারেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় নিজেই তার কন্যাকে এই ইসলামী স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন আর বলেন, এখন আমারও এবং আমার মেয়েরও প্রশান্তি লাভ হয়েছে যে, আমাদেরকে এখন আর কেউ আমাদের ধর্মের কারণে বিরক্ত করবে না। আমি জামা'তকে সত্য মেনে গ্রহণ করেছি। তাই অন্যদের সামনেও আমি আনন্দ এবং গর্বের সাথে এর বহিঃপ্রকাশ করব, যদিওবা তাদের খারাপ লাগে। এটি হলো সেই ঈমান যা তাদের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে।

রাশিয়ার একটি অঞ্চল হলো বুখারা। একজন নিষ্ঠাবান আহমদী রয়েছেন সুন্নত সুলতানো সাহেব। উজবেকিস্তানের বুখারা-র সাথে তার সম্পর্ক আর রাশিয়ায় চাকরি করেন। তিনি বলেন, আমি একা আহমদী আর নিজ স্ত্রী ও সন্তানকে আহমদীয়া ইসলামের শিক্ষার সাথে পরিচিত করাতে থাকি। আমার বাসনা হলো আমার স্ত্রী ও সন্তানও যেন আহমদী হয়ে যায়। অনেক দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও আহমদীয়া ইসলামের জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত করেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার স্বপ্নে আসেন আর আমার বুকে মাথা রেখে অনবরত সূরা ইখলাস পাঠ করছেন। যাতে আমি খুবই আত্মিক প্রশান্তি লাভ করি। অনুরূপভাবে আমি স্বপ্নে দেখি, আমি নিজ স্ত্রী ও পুত্রের সাথে জান্নাতে রয়েছি। আর সেখানে আমি হযরত মূসা ও হযরত ঈসাকে-ও দেখেছি। এই স্বপ্নের মাধ্যমে আমি এই প্রশান্তি পেয়েছি যে, জান্নাতের অর্থ হলো আহমদীয়া ইসলাম, যার শিক্ষা জান্নাত সদৃশ। আর আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় আমার স্ত্রী ও সন্তানকেও এই জান্নাতে নিয়ে আসবেন। এই

স্বপ্ন দেখার কয়েক দিন অতিবাহিত হতেই আল্লাহ্ তা'লা আমার ১৯ বছর বয়স্ক পুত্র দিয়ার বেগ সুন্নত-এর হৃদয় আহমদীয়া ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন আর সে বয়আত করে। আমার জন্য এটি বড়ই আনন্দের দিন ছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই আমার স্ত্রীর হৃদয়ও উন্মুক্ত করে দিন এবং আহমদীয়া ইসলামের ক্রোড়ে নিয়ে আসুন। এ হলো তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

যুক্তরাজ্যের একজন নব আহমদী মহিলা রয়েছেন। তিনি বলেন, আমি মুসলিম ঘরের সন্তান, কট্টর সুন্নী পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, আমাকে এটিই বলা হয়েছিল যে, সুন্নী ইসলামই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে জিলিংহামে নাসের মসজিদের আযান শুনলে বাড়ি ফিরে আমি আমারপিতাকে অনেক আনন্দের সাথে জানাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি সুন্দর মসজিদও রয়েছে। এতে আমার পিতা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে, এটি তো আহমদীদের মসজিদ। তিনি আমাকে কঠোরভাবে বারণ করেন যে, এটি কাদিয়ানীদের মসজিদ আর তারা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী নয়, (এগুলো সব মিথ্যা অপবাদ) আর তারা নিজেদের নবী বানিয়ে নিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তুমি এই মসজিদ থেকে দূরে থাকবে। তিনি বলেন, আমি প্রথমে তার কথা মেনে নেই, কিন্তু আমার মন মানেনি। আমার মনে হলো, আহমদীদের সম্পর্কে আমার আরও খোঁজ খবর নেওয়া উচিত। কিন্তু অপরদিকে পরিবারের ভয়ও ছিল যে, কোথাও ধরা না পড়ে যাই আর তারা অসন্তুষ্ট না হয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে কতক আহমদী ছাত্রের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। তাদের সাথে ইসলাম আহমদীয়াত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে থাকে। প্র থমে আমি তাদের কাছে এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করতে থাকি যে, সুন্নী ইসলামই প্রকৃত ইসলাম। কিন্তু এ ধরনের আলোচনার ফলে আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণা করার আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওয়েব সাইটের ঠিকানা পাই। সেখানেও আমি অনেক ভিডিও দেখার সুযোগ পাই এবং পড়ার জন্য অনেক বইপুস্তক পাই। ইসলাম সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল যেগু লোর সন্তোষজনক উত্তর আমি কোথাও পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আমি যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বইপুস্তক অধ্যয়ন করি তখন আমি আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে থাকি। (এখানে আহমদী যুবকদেরও প্রণিধান করা উচিত যে, তারা যদি অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে তাহলে উত্তরও পাওয়া যাবে। কতিপয় যুবক অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও যায়)। তিনি বলেন, এরপর আমি দোয়া করতে থাকি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কোনো নিদর্শন দেখান।

[হেদায়েত লাভ করার এবং সঠিক পথ অন্বেষণ করার এটিও অনেক বড় একটি মাধ্যম, তা সে পুরোনো আহমদী হোক অথবা নতুন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করা আবশ্যক যে, (হে আল্লাহ!) আমাদের ঈমান যেন সুদৃঢ় থাকে আর আমাদেরকে কোনো নিদর্শন দেখাও এবং আমাদের হেদায়েত দিতে থাকো]।

যাহোক তিনি বলেন, এই সময়ের মাঝে আমি অনেকগুলো স্বপ্ন দেখি। একটি স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি নদীর তীরে রয়েছি আর অপর প্রান্তে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কোনো একটি হলে যাচ্ছেন। আমি নদী পার হয়ে ওপারে যেতে চাচ্ছি, কিন্তু পানির স্রোত অতি প্রবল। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ব লেন, আল্লাহ্ নিজ বান্দাকে একাকী পরিত্যাগ করেন না। সাথে সাথে সেই নদী শেষ হয়ে যায় আর আমি অপর প্রান্তে পৌঁছে যাই। অনুরূপভাবে অপর এক স্বপ্নে তিনি [হুযূর বলেন] আমাকেও দেখেন আর এমনভাবে দেখেন যার ফলে তিনি খুবই প্রভাবিত হন। তিনি বলেন, আরও একটি স্বপ্নে আমি আমার দাদীকে দেখেছি। তিনি আমাকে বলছিলেন যে, ইসলামাবাদ যখন যাবে তখন আমাকেও (দোয়ায়) স্মরণ রাখবে। তিনি বলেন, এই সকল স্বপ্ন আমার জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল, তাই আমি বয়আত গ্রহণ করি। অতএব এভাবে হাত ধরে আহমদীয়াতের দিকে নিয়ে আসা এবং হৃদয়ে ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি করা- এটি ঐশী সাহায্যের নিদর্শন নয় তো আর কী?

এরপর দেখুন! আফ্রিকার একটি দেশের এক গ্রামে এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য দেয়ার পর কীভাবে তার ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছেন।

বুর্কিনা ফাসো-র ডোরি অঞ্চলের টাকা জামা'তের এক আহমদী যুবক জাবের সাহেব কৃষিক্ষেতে কাজ করছিলেন। উগ্রপন্থীরা তাকে ধরে ফেলে এবং বলে, যেভাবে গতকাল আমরা মেহদিয়াবাদে আহমদীদেরকে হত্যা করেছি ঠিক সেভাবে তোমাকেও হত্যা করব। এরপর তার মোবাইল ফোন নিয়ে চেক করলে তাতে জামা'তের মুবাল্লেগদের বক্তৃতা পায়। বক্তৃতা শুনে তারা বলে, আমরা এদের সবাইকে খুঁজছি, কেননা এরা রেডিওতে আহমদীয়াতের তবলীগ করে। এরপর তারা সেই আহমদী যুবকের কাছে তার পিতার ঠিকানা জানতে চায় আর বলে, আগামীকাল আমরা তোমাদের গ্রামে আসবো। জাবের সাহেব একথা শুনে ঘরে ফিরেন এবং নিজ পিতা ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ডোরিতে অবস্থিত মুহাম্মদাবাদ,যেখানে জামা'তের সদস্যদের বসতি রয়েছে, সেখানে চলে যান আর ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে চলে আসেন। পরবর্তী দিন উগ্রপন্থীরা তাদের গ্রামে যায় এবং এক ব্যক্তির কাছ থেকে জোর করে তাদের ঘরের ঠিকানা নিয়ে সেখানে পৌঁছে। পুরো ঘর তল্লাশী করে, আসবাবপত্র তুলে বাইরে ফেলে দেয় আর একইসাথে বলতে থাকে, এখানে যারাই আহমদী আছে তাদেরকে আমরা হত্যা করব। যাহোক, তারা পূর্বেই সেখান থেকে চলে এসেছিলেন আর সেখানে জামা'তের ব্যবস্থাপনার অধীনে মুহাম্মদাবাদ-এ অবস্থান করছেন।

বুর্কিনা ফাসো-র শহীদরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে সেখানকার আহমদীদের ঈমানকে দুর্বল করেননি, বরং প্রত্যহ তাদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি হচ্ছে। এখন এই দরিদ্র মানুষরাও তাদের যৎসামান্য আসবাবপত্র যা-ই তাদের ঘরে ছিল, ঘরবাড়ি এবং আয়উপার্জনের যে সামগ্রী ছিল, যেগুলোর ওপর তারা নির্ভরশীল ছিলেন, সমস্ত কিছু ছেড়ে এসেছেন, কিন্তু নিজ ঈমানকে পরিত্যাগ করেননি। তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের কয়েক বছরই মাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে তারা উত্তরোত্তর উন্নতি করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কেউ নয় যিনি এভাবে তাদের ঈমানকে দৃঢ়তা প্রদান করছেন।

একদিকে আমরা আহমদীয়াতের বিরোধিতা সত্ত্বেও ঈমানী দৃঢ়তার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিআর অপরদিকে এই (দৃশ্যও) প্রচুর দেখা যায় যে, কীভাবে খোদা তা'লা মানুষের হৃদয়কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার জন্য উন্মুক্ত করছেন। তিনি (আ.) বলেন, এটিই সেই ক্ষণ, অনুসন্ধান করো, তাহলে এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লাও সহায়তা করবেন।

মধ্য আফ্রিকার একটি স্থান হলো ইয়ালোকে। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে সেখানে গেলে প্রায় দেড় শত নারী-পুরুষ সেখানে তবলীগ শুনার জন্য সমবেত হয়। তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করি। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানকার কেন্দ্রীয় ইমাম সামসা উমর সাহেব কথা বলার অনুমতি চান। তিনি তার কথা এই আয়াত দিয়ে শুরু করেন যে, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (বনী ইসরাঈল: ৮২) অতঃপর তিনি বলেন, আপনি যে বার্তা দিয়েছেন (পূর্বে) আমরা কখনো তা শুনিনি আর (এ বিষয়ে) অনুসন্ধানও করিনি। আলহামদুলিল্লাহ, আজ আমাদের গ্রামে সত্যের আগমন হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, "ইমাম মাহদী (আ.) আসলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে মান্য করবে।" আজ আমি এবং আমার চল্লিশ জন সাথী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রবেশ করছি। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই সত্যের ওপর অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন। তো এভাবেও মানুষ (জামা'তে) অন্তর্ভু ক্ত হচ্ছে।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীদেরও কীভাবে জামা'তের প্রতি আকৃষ্ট করেন- এরও অগণিত ঘটনা রয়েছে। মালি-র কোলি কোরো অঞ্চলের একটি স্থানের নাম হলো নেমনা।[সেখান থেকে একজন] বলেন, এবছর কোলি কোরো জামা'ত তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক জলসার আয়োজন করে। এর পূর্বে রেডিওতে এর ঘোষণা করা হয়। এই গ্রামটি দূর হওয়ারকারণে কখনো সেখানে রেডিও'র কথা শোনা যায় আবার কখনোবা শোনা যায় না। কিন্তু সেই দিনগুলোতে সেখানে রেডিও'র কথা শোনা গিয়েছে আর তা শুনে এক অ-আহমদী বন্ধুসিদ্দীক জারাহ সাহেব জলসাতে অংশগ্রহণের সংকল্প করেন। তার সাথে তার একজন বন্ধু ছিলেন, যিনি তাকে প্রতিনিয়ত আহমদীয়াতের শিক্ষামালা না শুনতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, আহমদীয়াতের কথা শুনবে না, তারা কাফের। যাহোক, তার জোরাজুরিতে উভয় বন্ধু জলসায় অংশগ্রহণ করেন। আর বহু কষ্টে আশি কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন, সেখানে সড়ক ইত্যাদি খুব একটা নেই। যাহোক, সন্ধান করতে করতে জলসার দুইদিন পূর্বে তারা জলসার স্থানে এসে পৌঁছেন। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং জামা'তের সদস্যরা তাদের আতিথেয়তা করেন। জলসার পূর্বে ই তারা আহমদীয়াত সম্পর্কে পরিচিত হন আর জলসার দিনগুলোতে বক্তৃতামালা শুনেন। বাজামা'ত তাহাজ্জুদ আদায় এবং জামা'তের সদস্যদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক দেখে তারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। জলসার শেষদিন যখন তাকে অতিথি হিসেবে নিজের অনু ভূতি ব্যক্ত করার জন্য আহ্বান করা হয় তখন তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর আহমদীয়াত গ্রহণের ঘোষণা দেন। এর অনতি পরই তার বন্ধু কিছু কথা বলতে চান। তিনি বলেন, আসলে আমি আমার বন্ধুর মনে কুধারণা সৃষ্টি করতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন আমি নিজেই আহমদীয়াতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছি। এরপর তিনি নিজেও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

কঙ্গো ব্রাযভিল'ও আফ্রি কার একটি দেশ। (সেখানকার) একজন যুবক হলেন সিরিল সাহেব। যিনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এফ.এ. সম্পন্ন করেছেন। একটি গ্রামের ক্যাথলিক মিশনারীর কাছ থেকে তিনি খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন আরম্ভ করেন। মিশনারীর শিক্ষা সমাপান্তে চার্চের মাধ্যমে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ছিল। এরই মাঝে আমাদের স্থানীয় মুবাল্লেগের সাথে তার যোগাযোগ হয়। তিনি (মুবাল্লেগ) বলেন, তাকে আমরা তবলীগ করা আরম্ভ করি। তিনি দেখলেন যে, আহমদীয়া জামা'তের দলিলসমূহের কোনো উত্তর তার কাছেও নেই, এমনকি তার মিশনারী শিক্ষকের কাছেও নেই। এভাবে তিনি খ্রিষ্টান মিশনারী হওয়ার পরিবর্তে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভু ক্ত হয়ে যান আর এখন দাঈ ইলাল্লাহ্ হিসেবে আহমদীয়া ইসলামের তবলীগ করছেন।

সেনেগালের তাম্বাকোন্ডা অঞ্চলের একটি এলাকায় তবলীগী প্রোগ্রাম করা হয়।[সেখানকার একজন] বলেন, সেখানে কয়েক বছর পূর্বে এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রী-সন্তানসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীরা বিরোধিতা করছিল। এ বছর গ্রাম্য প্রধান এবং ইমামের সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ করে তবলীগী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আশেপাশের গ্রাম্য প্রধান এবং ইমামদের পাশাপাশি সাধারণ লোকদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। মুয়াল্লেম সাহেবগণ ইসলামের বর্তমান অবস্থা, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রয়োজনীয়তা,অর্থাৎ এযুগে তাঁর প্রয়োজনীয়তা আছে কী, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন এবং ইসলামের উন্নতিতে আহমদীয়া জামা'তের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। নিকটবর্তী গ্রাম থেকে যারা এসেছিলেন তারা বলেন যে, তারা প্রতিবেশী দেশ গাম্বিয়াতেআহমদীয়াতের নাম শুনেছিলেন, কিন্তু তারা [আহমদীয়াতের] ধর্মবিশ্বাস প্র ভৃতি সম্পর্কে জানতেন না। আজকে এই জলসায় জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর বিনাবাক্য ব্যয়ে তারা আহমদীয়াতে প্রবেশের ঘোষণা প্রদান করেন। এরপর গ্রামের ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে আহমদীয়াতের সত্যতার ঘোষণা দেন। তারপর তাদের গ্রাম্য প্রধান স্বীয় পরিবারসহ আহমদীয়াতে প্রবেশের ঘোষণা দিয়ে বলেন, উপস্থিত সকলের মাঝে যদি কারো কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে এখনই এখানে বলে দিক, নতুবা পরবর্তীতে কোনো চালাকি বা অজুহাত চলবে না। এরপর উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিবারসহ আহমদীয়াতে প্রবেশের ঘোষণা দেয়। তো এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ধরে ধরে ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ করিয়ে থাকেন।

উজবেকিস্তান, যা রাশিয়ান স্টেটগুলোর মধ্য থেকে একটি দেশ, [সেখানকার] একজন নবআহমদী হলেন মুসলেম উদ মনসূর সাহেব। তিনি বলেন, পূর্বে আমি ইমাম আবু হানিফার মতের অনুসারী ছিলাম। একদিন আমার এক বন্ধু আরবী শেখার উদ্দেশ্যে আমাকে এক আহমদী শিক্ষকের কাছে নিয়ে যায়। আমি আরবী শেখার পাশাপাশি আমার শিক্ষকের কাছেইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নও করতে থাকি। আমি এতো ভালো উত্তর পেয়েছি যে, আমার মন তৃপ্তি লাভ করে।

{যদি সঠিক উত্তর পেতে হয়, যা মনে ধরার মতো যৌক্তিক উত্তর হবে এবং বাস্তবসম্মতও হবে, তাহলে আহমদীয়া জামা'ত ব্যতীত অন্য কোথাও তা পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব উত্তর শিখিয়েছেন এবং এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।}

তিনি বলেন, আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করতাম যে, এসব উত্তরের উৎসমূল কোথায়? মূল উৎস কোথা থেকে পাওয়া যাবে? তখন আমাদের শিক্ষক আমাদেরকে আহমদীয়া জামা'তের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমার হৃদয় তো পূর্বেই আশ্বস্ত ছিল, অতএব, আমি বয়আত গ্রহণ করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে এই পথে অবিচল রাখেন।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষের কাছে কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতাই প্রমাণ করেন না, বরং আহমদীয়া খিলাফত ব্যবস্থাপনার সাথে স্বীয় সাহায্য-সমর্থনের দৃশ্যাবলিও প্রদর্শন করেন এবং স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান করেন।

সেনেগালের তাম্বাকোন্ডা অঞ্চলের মুয়াল্লেম সাহেব তবলীগী সফরে যান। তিনি বলেন, মুয়াল্লেম সাহেবরা তবলীগ করা আরম্ভ করেন আর জামা'তের পরিচয় তুলে ধরেন।তখন এক বন্ধু মুহাম্মদ জিয়ালু সাহেব বলেন, আপনারা কি আহমদীয়া জামা'তের লোক? মুয়াল্লেম সাহেব একথার উত্তর দিলে জিয়ালু সাহেব বলেন, গতকালই তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, এক ব্যক্তি তার স্বপ্নে আসে এবং তাকে বলে, ইসলামের সমস্ত ফিরকার মাঝে আহমদীয়া ফিরকাই সত্য ও সঠিক ইসলামের মুখপাত্র, তুমি এতে প্রবেশ করো। আর পরের দিনই আপনারা এসেছেন। সুতরাং এতে কিছু সত্যতা নিশ্চয়ই রয়েছে। মুয়াল্লেম সাহেব মোবাইল থেকে খলীফাগণের ছবি তাকে দেখান, [হুযূর বলেন,] আমার ছবিও তাকে দেখান। আরআমার ছবি দেখে তিনি বলেন যে, এই ব্যক্তিই স্বপ্নে আমার কাছে এসেছিলেন এবং এটিও বলেছিলেন যে, আমি আহমদীয়া জামা'তের খলীফা। এই ঘটনা শুনিয়ে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং সেখানেই পরিবারসহ অত্যন্ত আবেগের সাথে তিনি আহমদীয়াতে যোগদানের ঘোষণা দেন। এখন তিনি তবলীগও করছেন।

অতঃপর স্বপ্নের মাধ্যমেই আহমদীয়াত গ্রহণের আরেকটি ঘটনা রয়েছে। কঙ্গো কিনশাসা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দেশ। কয়েকশ মাইলের দূরত্ব। সেখানকার একটি জামা'তের প্রেসিডেন্ট বাসেম মুনির সাহেব, যিনি খ্রিষ্টধর্ম থেকে আহমদী হয়েছিলেন, তিনি বলেন, যখন

জামা'তের মু বাল্লেগরা এখানে তবলীগের উদ্দেশ্যে আসেন তখন আমি ইসলামকে উগ্রপন্থি ধর্ম মনে করতাম। {অমুসলিমদের ইসলামের ব্যাপারে এটাই তো অপপ্রচার।} কিন্তু যেই ইসলামের কথা আহমদী মু বাল্লেগরা বলতেন সেটি আমার জন্য অদ্ভুত ছিল। আর খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আমি এমনিতেই বিরক্ত ছিলাম। এসব কিছু দেখে আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। অতএব,

আমি দোয়া করা শুরু করলাম। সেই সময়েই এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন বুযুর্গ এসে বলছেন, এদেরকে পরিত্যাগ করো আর এদিকে চলে এসো। এই স্বপ্নে র ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এটি বুঝান যে, তুমি খ্রিষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে আহমদীয়াতের দিকে চলে আসো। অতএব আমি বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভু ক্ত হয়ে যাই।

আফ্রিকার আরেকটি দেশের নাম চাঁদ। পরবর্তী ঘটনাটি এই স্থানের। আব্দুল্লাহ্ মুসাআরব গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেন। মু বাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন যে, কয়েক মাস পূর্বে আমাদের স্থানীয় মু য়াল্লেম তার সাথে সাক্ষাতের জন্য যান। হিউম্যানিটি ফার্স্টের কাজের জন্য মু য়াল্লেম সাহেব তার এলাকাতেও যান। মু য়াল্লেম সাহেব যখন দ্বিতীয়বার তাদের এলাকায় যান তখন তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'ইসলামী নীতি দর্শন' এর আরবী অনুবাদ পড়ার জন্য দেন। কয়েক সপ্তাহ পর আব্দুল্লাহ্ সাহেব চাঁদের রাজধানীতে আসেন আর মু য়াল্লেম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে প্রশ্ন করেন আর বলেন, আমি ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার ব্যাপারে আমাদের আলেমদের কাছে অনেক প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কেউ যথার্থ উত্তর দেয়নি। রাতে মু য়াল্লেম সাহেবের কাছেই তিনি অবস্থান করেন। রাতভর আহমদীয়া জামা'ত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পথপ্রদর্শন করেন। প্রভাতে ফজরের নামাযের পর কিছুক্ষণের জন্য তিনি শুয়ে পড়েন এবং হঠাৎ জেগে উঠেন। মু য়াল্লেম সাহেবকে বলেন, যখন আমি ঘুমিয়েছিলাম তখন স্বপ্নে আমি এই আওয়াজ শুনতে পাই যে, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا মুয়াল্লেম সাহেব যখন এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, এতে তো আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার সত্যতার দলিলও রয়েছে। এতে আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, খোদা তা'লা আমাকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তিনি আরবী জানতেন। যাহোক এটিও এই আয়াতের একটি অর্থ, ফলে তিনি আহমদী হয়ে যান।

মার্শাল আইল্যান্ড (উত্তর) আমেরিকার একেবারে সীমান্তের একটি দ্বীপ। সেখানকার মু বাল্লেগ সাহেব লিখেন, হারমান লাজের সাহেব একজন কলেজ শিক্ষক ছিলেন। মু বাল্লেগ সাহেব তার সাথে যোগাযোগ করেন, কেননা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মার্শাল ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন ছিল। [তিনি বলেন,] অনুবাদের জন্য যখন তার কাছে যাই আর তিনি জানতে পারেন যে, এটি পবিত্র কুরআনের আয়াত, তখন তিনি ঘাবড়ে যান। ইসলাম ধর্ম তার জন্য একেবারেই নতুন ছিল। তিনি বলেন, যেকোনো ধর্মীয় বিষয় অনুবাদ করতে আমি ভয় পাই বিশেষত এজন্য যে, বাইবেল ও কুরআনের মাঝে কঠোর মতপার্থক্য রয়েছে। যাহোক তিনি অনুবাদ করে দেন। তিনি বলেন, কয়েক মাস পর আমি তার কাছ থেকে মার্শাল ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তিনি ভাষা শেখানোর জন্য মসজিদে আসতে থাকেন। এরই মাঝে বহুবার ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন মহানবী (সা.) এর শিক্ষা সম্পর্কে তাকে অবহিত করতাম যার ফলে ভদ্রলোক ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত হন। এরই মাঝে আমি মার্শাল আইল্যান্ডে বসবাসকারীদের এবং সেখানকারমু বাল্লেগকে এই বার্তা পাঠিয়েছিলাম যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'আমাদের শিক্ষা'-র মার্শাল ভাষায় অনুবাদ করুন। কেননা নতুন আহমদীদের তরবিয়তের অনেক বেশিপ্রয়োজন হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমি পুনরায় লাজের সাহেবের সাথে এই বিষয়ে কথা বলি। আর তিনি সহযোগিতা করতে সম্মত হন। তিনি বলেন, এখন ইসলাম সম্পর্কে তার ধারণা পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিল। এবার তিনি তার চাকরির ব্যাপারে দুশ্চিন্তার উল্লেখ করেন। এতে আমি তাকে বলি যে, দোয়া করুন, কিন্তু ঈসা (আ.)-এর নাম নিয়ে নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করুন। অতএব তিনি দোয়া করতে থাকেন আর কয়েক সপ্তাহ পরে সংস্কৃতি বিষয়ক

মন্ত্রণালয় তার কর্মক্ষেত্রের নতুন একটি বিভাগ খুলে তাকে চাকরি প্রদান করে। অর্থাৎ, তিনি যেখানে আবেদন করেছিলেন তৎক্ষণাৎ তিনি সেখানে চাকরি পেয়ে যান। ভদ্রলোক বলেন, এখন যখন আমি দোয়া করি তখন নিজেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম নিতে বিরত রাখি, আর এর পরিবর্তে খোদা তা'লার কাছে দোয়া করি। কিছুদিন পর তার চাকুরির অনুমোদনও চলে আসে। দোয়া গৃহীত হওয়ার এই নিদর্শন দেখে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহিত্য পাঠ করে লাজের সাহেব বয়আত গ্রহণ করেন। সেইসাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'আমাদের শিক্ষা'-র মার্শাল ভাষায় অনুবাদও সম্পন্ন হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের হৃদয় ইসলাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরপ্রতি আকৃষ্ট করছেন। কোথায় খ্রিষ্টানরা পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য বিস্তারের কথা বলতোআর কোথায় এখন খ্রিষ্টানরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। এত কিছু দেখেও যদি এসব নামসর্বস্ব ধর্মের ঠিকাদারদের দৃষ্টি উন্মোচিত না হয় তাহলে তাদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের বার্তাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পেঁ ৗছানোর জন্য আহমদীয়া জামা'ত দ্বারা যে কাজ নিচ্ছেন সেটি তো ইনশাআল্লাহ্ তা'লা বিস্তৃত, ফলপ্রদ ও সম্প্রসারিত হবে; কেউ নেই যে খোদার এই কাজকে থামাতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয়টিকেওবুঝতে হবে যে, শুধুমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবিকে মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং আমাদেরকে নিজেদের মাঝে সেসব পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে যা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ হবে। যা মহানবী (সা.) এর সুন্নতের পথে পরিচালিত হওয়ার ব্যবহারিক চিত্র হবে। আর যখন এমনটি হবে তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারীও হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ্যও দান করুন।

ফিলিস্তিনিদের জন্যও দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই অত্যাচার থেকে মুক্তি দান করুন যা তাদের প্রতি করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এখন কয়েকদিনের জন্য যুদ্ধবিরতি দেওয়া হবে যেন জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সাহায্য পাঠানো সম্ভব হয়। কিন্তু এরপর কী হবে? সাহায্য পেঁ ৗছিয়ে পুনরায় তাদেরকে মারা হবে? ইসরাঈল সরকারের অভিপ্রায় খুবই ভয়ংকর মনে হচ্ছে। কেননা তাদের সরকারের একজন বিশেষ উপদেষ্টা দু একদিন পূর্বে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, এই যুদ্ধ বিরতির পর যদি পুনরায় দ্রুততম সময়েযুদ্ধ আরম্ভ করা না হয় তাহলে আমি সরকার থেকে বেরিয়ে যাব। অতএব এ হলো তাদের চিন্তাভাবনা।

বড় বড় পরাশক্তিগুলো বাহ্যত সহানুভূতির কথা বললেও ন্যায়বিচার করতে চায় না। আর এই বিষয়ে তারা আন্তরিকও নয়। তাদের এই অনুধাবন শক্তিই নেই। তারা ভাবছে এটি সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু তাদের মাঝে যারা বুদ্ধিমান রয়েছে এখন তারাও বলা আরম্ভ করেছে যে, এই যুদ্ধ শুধু এই এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের দেশ পর্যন্তও পেঁ ৗছে যাবে।

মুসলিম সরকারগুলো এখন কিছুটা বলা আরম্ভ করেছে। যেমন শুনেছি সৌদি বাদশাহ্ও বলেছেন যে, মুসলমানদের একতাবদ্ধ হয়েকথা বলা উচিত। অতএব একতাবদ্ধ হতে হবে আর এর জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের মাঝে যদি এই চেতনা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই চেতনাকে বাস্তবায়িত করারও সামর্থ্য দিন। যাহোক দোয়ার প্রতি অনেক মনোযোগ দিন।

নামাযের পর আমি কয়েক জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হলোমুরব্বী সিলসিলা আব্দুস সালাম আরেফ সাহেবের। তিনি কয়েকদিন পূর্বে ৫৪ বছর বয়সে মৃ ত্যু বরণ করেছেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন***।। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার বড় নানা মোকাররম হাজী হাসান খান সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় খলীফার যুগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তার স্ত্রী পূর্বেই মৃ ত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুইপুত্র দান করেছেন। উভয়েই কুরআনের হাফেয। একজন মুরব্বী সিলসিলা এবং অপরজনও আমার মনে হয় ওয়াকফে জিন্দেগী।

তার পুত্র মুরব্বী সিলসিলা হাফেয আব্দুল মুনীম বলেন, মরহুম আমাদের অনেক ভালোবাসতেন, খুবই ভালোবাসার সাথে তরবিয়ত করেছেন। আর শুধু নিজ সন্তানদেরই ভালোবাসেননি, বরং নিজের আত্মীয়স্বজনের সাথেও আন্তরিকতাপূর্ণ ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। অন্যদের সাথেও অনেক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এ কারণেই তার মৃত্যুর পর অনেক লোক এসেছে এবং নিজেদের সম্পর্কের কথা বলেছে। তিনি বলেন, আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্তা'লা এবং তাঁর রসূল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর খিলাফতের প্র তি ভালোবাসা এত দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করেছেন যে, এখন আমাদের হৃদয় থেকে তা কখনো দূর হতে পারে না। বরং আমাদের এটাও বলেছেন যে, নিজ সন্তানদেরও এই উপদেশ দিতে থাকবে। {হ্যাঁ, দুই ভাই-ই ওয়াকফে জিন্দেগী, দ্বিতীয় ভাইও ওয়াকফ করেছেন।} মায়ের মৃত্যু হলে ধৈর্যের অনেক উপদেশ দিয়েছেন, নিজেও অনেক ধৈর্য ধারণ করেছেন।

তার এক বন্ধু মুরব্বী সিলসিলা রাজা মোবারক সাহেব বলেন, আমি তার সহপাঠী ছিলাম আর জামেয়াতেও এবং কর্মক্ষেত্রেও অধিকাংশ সময় তার সাথে কেটেছে। একজন ফিরিশতা সুলভ বৈশিষ্ট্যের মানুষ ছিলেন। ইবাদতেও উচ্চমানের এবং বুযুর্গীতেও উচ্চমার্গের ছিলেন। আমি তার কাছ থেকে অনেক বিষয় শিখেছি। খুবই উন্নত মানের ভাষা ব্যবহার করতেন। যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন, কখনো কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। লোকেরা তার সাথে ঝগড়া করত, অন্যায়ও করত; কিন্তু তিনি সর্বদা হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। কখনো কাউকে অপমান ও লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেননি। উত্তমভাবে সবার খেয়াল রাখতেন। আর এটিই একজন প্রকৃত মুরব্বীর বৈশিষ্ট্য।তিনি আরও বলেন, যেখানেই তিনি ছিলেন শত শত মানুষের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণরূপে গ্রথিত করেছেন। এত গভীরে গিয়ে তিনি তরবিয়ত করেছেন যে, তার মৃত্যুতে যেখানেই তিনি ছিলেন (সেখান থেকে) লোকেরা এসেছে এবং মুরব্বী সাহেবের কথা বলে চিৎকার করে কান্না করেছে যে, আমাদের জামা'ত এতীম হয়ে গেছে। নিজে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে সফর করতেন। পাঁচ-দশ কিলোমিটার সফর পায়ে হেঁটেই করতেন। আর যখন তাকে বলা হতো জামা'ত তো সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে,রিকশা ইত্যাদির ভাড়া নিতে পারেন, তখন তিনি বলতেন আমি যদি জামা'তের অর্থ সাশ্রয় করি তাহলে তোমাদের কী সমস্যা! পায়ে হেঁটে সফর করতেন এবং মাইলের পর মাইল সফর করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর এমন বিশ্বস্ত ও পরিশ্রমী মুরব্বী জামা'তকে সর্বদা দান করতে থাকুন। আর তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দিন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ মুহাম্মদ কাসেম খান সাহেবের যিনি সম্প্রতি কানাডায় ছিলেন। তিনি বায়তুল মালের ব্যয়খাতের প্রাক্তন নায়েব নাযের ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ৮৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন***।। তিনি নযর আহমদ খান সাহেবের ছেলে এবং কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী সাহেবের জামাতা ছিলেন। তার ছেলে মুহাম্মদ খালেদ খান বলেন, তিনি চার খিলাফতের যুগ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তৃতীয় খিলাফতের পুরো সময়কালে তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মুজাহিদ ফোর্সে ক্যাপ্টেন হিসেবে দেশ ও জামা'তের সেবা করার সুযোগপেয়েছেন। যুদ্ধের সময় ফুরকান বাহিনী গঠন করা হয়েছিল, সেখানেও তিনি ছিলেন। পাঁচবেলার নামায ও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক ছিলেন। সন্তানদেরও এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতেন। সরলতা এবং বিশ্বস্ততার উন্নত দৃষ্টান্ত ছিলেন। সন্তানদেরও খিলাফতের সাথে সম্পৃ ক্ত থাকার নসীহত করে গেছেন। খিলাফতের জন্য এক উন্মুক্ত তরবারি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দিন।

আরেকটি স্মৃতিচারণ আমাদের জামা'তের বিখ্যাত কবি আব্দুল করীম কুদসী সাহেবের, যিনি কিছু দিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন***।। মরহুমের পরিবারেআহমদীয়াতের সূচনা তার পিতা মিয়াঁ আল্লাহ্ দিত্তা সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল যিনি ১৯৩৪ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। অতঃপর আহমদী হবার পর সারাজীবন ওয়াকেফে জিন্দেগীর মতো কাটিয়েছেন। সর্বদা তবলীগ অব্যাহত রেখেছেন। অনেক পরিবারকে আহমদী বানিয়েছেন এবং সারাজীবন ওয়াকফের প্রেরণা নিয়ে জামা'তের সেবা করেছেন।

তার স্ত্রী হলেন বুশরা করীম সাহেবা, যার বিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) পড়িয়েছিলেন। তাদের চার সন্তান রয়েছে এবং এক ছেলে আব্দুল কবীর কমর সাহেব মুরব্বী সিলসিলা, যিনি বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার শিক্ষক। কুদসী সাহেব নিজেও জামা'তের সেবা করেছেন। ৩০ বছর লাহোর জেলার রাচনা টাউন জামা'তের সেক্রেটারী মাল ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি পদ্য রচনায় দক্ষ ছিলেন। পঙ্ক্তি রচনা করতেন, সংকলনও রয়েছে। তার অনেক কবিতা সমগ্র ছাপা-ও হয়েছে। তার একটি অসাধারণ কাজ হলো, 'ইয়া আইনা ফাইযিল্লাহি ওয়াল ইরফানী' কাসীদার উর্দূ এবং পাঞ্জাবী ভাষায় সাবলীল অনুবাদ। এছাড়া দুররে সামীনের ৩১৩টি পঙ্ক্তি তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদও করেছেন।

তিনি বলেন, একসময় তার মাথায় এ ভূত চাপে যে, জামা'ত থেকে স্বাধীন হতে হবে। তিনি নিজেই লিখেন যে, ১৯৬৮ সালে চাকরিসূত্রে নিজ গ্রাম

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 4-11 Jan, 2024 Issue No.1-2

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কিরতো পিন্ডোরী থেকে লাহোরে আসেন এবং এখানে আসার পর পার্থিব চিন্তাভাবনা মাথায় ভর করে। নামায পড়তে কখনো মসজিদে যেতেন আবার কখনো যেতেন না, কেননা মসজিদ দূরে ছিল। জুমুআর নামাযও কখনো পড়তেন, আবার কখনো পড়তেন না। তিনি বলেন, একবার জুমুআর সময় এক বন্ধুর বাসায় দাওয়াত ছিল। পাশেই অ-আহমদীদের মসজিদ ছিল। তিনি সেখানেই জুমআ পড়তে চলে যান। মৌলবিদের যে অবস্থা তিনি বর্ণনা করেন আজও সেই একই অবস্থা বিদ্যমান। তো মৌলবি সাহেব অর্ধেক খুতবা সেজান-এর বিরুদ্ধে প্রদান করেন। সেজান আহমদীদের একটি পানীয় যা আহমদীদের কারখানায় প্রস্তুত হয়। যাহোক, তিনি বলেন, অন্যান্য কথার পাশাপাশি মৌলবি সাহেব এটিও বলে যে, তারা এতে রাবওয়ার মাটিও মিশিয়ে থাকে, অর্থাৎ রাবওয়ার মাটি সেজান-এ মিশিয়ে থাকে, তাই এটি পান করা মোটেই উচিত নয়। তিনি বলেন, আমি তার খুতবা যদিও শুনেছি কিন্তু নামায না পড়েই সেখান থেকেচলে আসি। তার বন্ধু বলে, কী হয়েছে? আমি বললাম, তুমি মৌলবির বাজে কথা শোনো নি? সে বলে, বাদ দাও, এসব কথা তো তারা বলতেই থাকে। যাহোক, খাবার খাই। তিনি বলেন, খাবার পর যখন বাইরে বের হই তখন দেখি, মৌলবি সাহেব একটি দোকানে দাঁড়িয়ে সেজান পান করছেন। তিনি বলেন, থাকতে না পেরে আমি মৌলবি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো এখনই সেজানের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে আসলেন অথচ এখন নিজেই তা পান করছেন। সে বলে, ডাক্তার আমাকে স্যাকারিন মিশ্রিত কোনো পানীয় পান করতে নিষেধ করেছে আর সেজান পান করতে বলেছে, কেননা এটি খাঁটি হয়ে থাকে। তাই আমি এটিকে ঔষধ মনে করে পান করি। তারপর আমি বললাম, রাবওয়ার মাটি মিশানোর কথার কী হবে? তখন অট্টহাসি দিয়ে মৌলবি সাহেব বলে, এমন চটকদার কথা না বললেআমাদের ব্যবসা কীভাবে চলবে? আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয় যে, আমরা ব্যবসা সাজিয়েছি অথছ নিজেরাই ব্যবসা খুলে বসেছে। যাহোক, উনার এ ধরনের অনেক ঘটনা রয়েছে। খিলাফতের সাথে তার প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল। অতঃপর নিজের সন্তানাদি এবং নিজের বংশধরের মাঝেও এ সম্পর্ককে বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছেন। আর আমি যেমনটি বলেছি, তিনি জামা'তের বিখ্যাত কবি ছিলেন এবং এটিকেই অনেক সম্মানের কারণ মনে করতেন।

জামা'তী কবিতার আসরে তিনি আবৃত্তিও করতেন এবং জামা'ত বিষয়ক অগণিত কবিতা লেখারও তিনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো মিয়া রফিক আহমদ গোন্দল সাহেবের। তিনিও কিছুদিন পূর্বে ৮১ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন***। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার পরিবারে তার দাদা কোটমোমেননিবাসী হযরত মিয়া খোদা বখশ গোন্দল সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। তিনি তার বংশে একাই আহমদী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যখন প্লেগের আবির্ভাব ঘটে তখন তার গায়েও প্লেগের গুটি দেখা দেয়। এখন যেহেতু নিদর্শনাবলির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, তো তার এ ঘটনাটিও একটি নিদর্শন। তিনি এর চিকিৎসা করাতে ভেরা যেতেন। ভেরায় থাকাকালীন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ উদ্ধৃতি পড়েন যে, আমার চার দেওয়ালের অন্তর্ভুক্ত যে হবে তাকে রক্ষা করা হবে। তিনি বাড়ি ফিরে আসেন এবং বলেন, আমি কাদিয়ান যাচ্ছি। তিনি যখন কাদিয়ানে পৌঁছেন তখন সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মোবারকেবসা ছিলেন এবং কিছু লিখছিলেন। তিনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যস্ততার কারণে কিছু বলতে পারেননি। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন অবসর হন তখন তিনি তাঁর কাছে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছেনিজের পরিচয় দেন এবং বলেন যে, আমি আপনার প্লেগ থেকে সুরক্ষিত থাকার কথা অর্থাৎএই ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে যে প্রবেশ করবে সে প্লেগ থেকে সুরক্ষিত থাকবে- এটি শুনে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। যাহোক, সেখানে কথাবার্তা হয়, তিনি বয়আত করেন এবং বয়আত করার পর তার গুটিগুলোও সেরে যায়। এ বিষয়টিকেও তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি নিদর্শন মনে করতেন এবং [অন্যদের] শোনাতেন। স্বয়ংমিয়া রফিক গোন্দল সাহেব এবং তার ছেলেকে একবার লাহোরে ছাত্ররা আটক করে ভীষণ মারধর করে। ছেলেরা যখন তার ছেলেকে মারছিল তখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে তিনি নিজেও আহত হন, তার হাতও ভেঙে যায়। যাহোক তিনি জামা'তের জন্য মারও খেয়েছেন। তিনি মালেক উমর আলী খোখর সাহেবের জামাতা ছিলেন আর মালেক উমর আলী সাহেবের প্র থম স্ত্রী ছিলেন হযরত মীর ইসহাক সাহেবের কন্যা। ফলে তার স্ত্রী হযরত মীর ইসহাক সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন। তার সন্তানদের মাঝে এক ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে। এক ছেলে এবং এক মেয়ে আমেরিকায় থাকে। তার এক মেয়ে রিফআত সুলতানা ডাক্তার মাশহুদ আহমদের স্ত্রী, যিনি রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে কর্মরত আছেন।

তার স্ত্রী লিখেন, তিনি নামায এবং তাহাজ্জুদে নিয়মিত ছিলেন। দরিদ্রদের অনেক খেয়াল রাখতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দিন।

সর্বশেষ স্মৃতিচারণ আমেরিকা নিবাসী শ্রদ্ধেয়া নাসীমা লাইক সাহেবার। তিনি মডেল টাউন লাহোরের শহীদ সৈয়দ লাইক আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। কিছু দিন পূর্বে তিনিও মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন***।। তিনি হিন্দুস্তানের ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবুল হাসান সাহেব আহমদী ছিলেন না। তার মা আমাতুল বারা সাহেবা নিজে বয়আত করেন এবং আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হন। এই একটি আমল সে যুগে ছিল যে, স্ত্রীরা যদি বয়আত করত তবে কতক স্বামী এমন ভদ্র ছিল যারা তাদের স্ত্রীদের জোর করত না যে, কেন আহমদী হয়েছো? যাহোক, মা আহমদী হয়েছিলেন এবং মায়ের দৃঢ় ঈমান ও খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্কে র কারণে মেয়েদের বিয়েও তিনি আহমদী পরিবারে দিয়েছেন। আর সব বোনেরাই আহমদী।

তার মেয়ে হুমায়রা সাহেবা আমেরিকায় থাকেন। তিনি বলেন, মরহুম জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে পরিপূর্ণরূপে সম্পৃক্ত ছিলেন। নিজের জীবন ধর্মসেবায় উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। জামা'তের সত্যিকার ভালোবাসার প্রেরণা ও মানবতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তার হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল, বিশেষত অভাবীদের জন্য এবং নিজের চারপাশে বিদ্যমান মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।

তার এক মেয়ে নুযহাত সাহেবা এখানে যুক্তরাজ্যের ওয়ালসল-এ বসবাস করেন। তিনি বলেন, পরম নিষ্ঠাবতী, খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত, জামা'তের নেযামের প্রতি অনুগত ছিলেন। অত্যন্ত নির্ভিক ও সত্যভাষী নারী ছিলেন আর কখনো তা থেকে পিছপা হতেন না। অপসংস্কৃতি এবং বিদআতকে ভীষণ অপছন্দ করতেন আর নিজ সন্তানদেরও সর্বদা এ বিষয়ে নসীহত করতেন যে, একজন আহমদী মুসলমানের সকল প্রকার বৃথা বিষয়াদি পরিহার করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। উত্তরসূরি হিসেবে চার পুত্র এবং চার কন্যা রয়েছে। তার এক ছেলে আমেরিকায় ডাক্তার। তিনি আমাদের সফরকালে সাথে থাকেন, অত্যন্ত সেবা প্রদানকারী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্র হেরআচরণ করুন আর তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দিন।

****

১ম পাতার পর....

অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। সেও কখনও ডান দিকে কখনও বামদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল আর অবিরাম কেঁদে কেঁদে বলছিল, সকলেই মারা গেছে, কেউ বেঁচে নেই। কেউ কেউ বর্ণনা করেছে, বিপদগ্রস্ত মানুষদের যখন জিজ্ঞাসা করা হত,তখন তারা উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত। এছাড়াও অনেকে এই শোকের অভিঘাতে উন্মাদ হয়ে গেছে। সেই সময় পত্রিকায় প্রকাশিত হত যে, কোয়েটা থেকে মুলতান গাড়িতে আসার পথে দুই মহিলা চরম শোকে পাগল হয়ে যায়। আরও এক ব্যক্তি পাগল হয়ে যায় এবং চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দেয়। বলার অর্থ এই যে, এটা এমনই এক বেদনাদায়ক দৃশ্য ছিল যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা ছাড়াও যারা তাদের কথা পত্রিকায় পড়েছে, তারা শিহরিত হয়ে উঠত আর তাদের মনও আকুল হয়ে উঠত।

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ বিহরে যখন এক প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্প হল, যার সম্পর্কে , ভারতের সাবেক ভাইসরায় লর্ড রেডিং লন্ডনে এক বক্তৃতা করতে গিয়ে অশ্রু সিক্ত চোখে বলেছিলেন, 'এই ভূমিকম্প এমন ভয়ঙ্কর যে, ভারতের ইতিহাসে এর নজির নেই। '(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir